বিজ্ঞান পত্রিকা

একাদশ সংখ্যা | মে ২০১৮

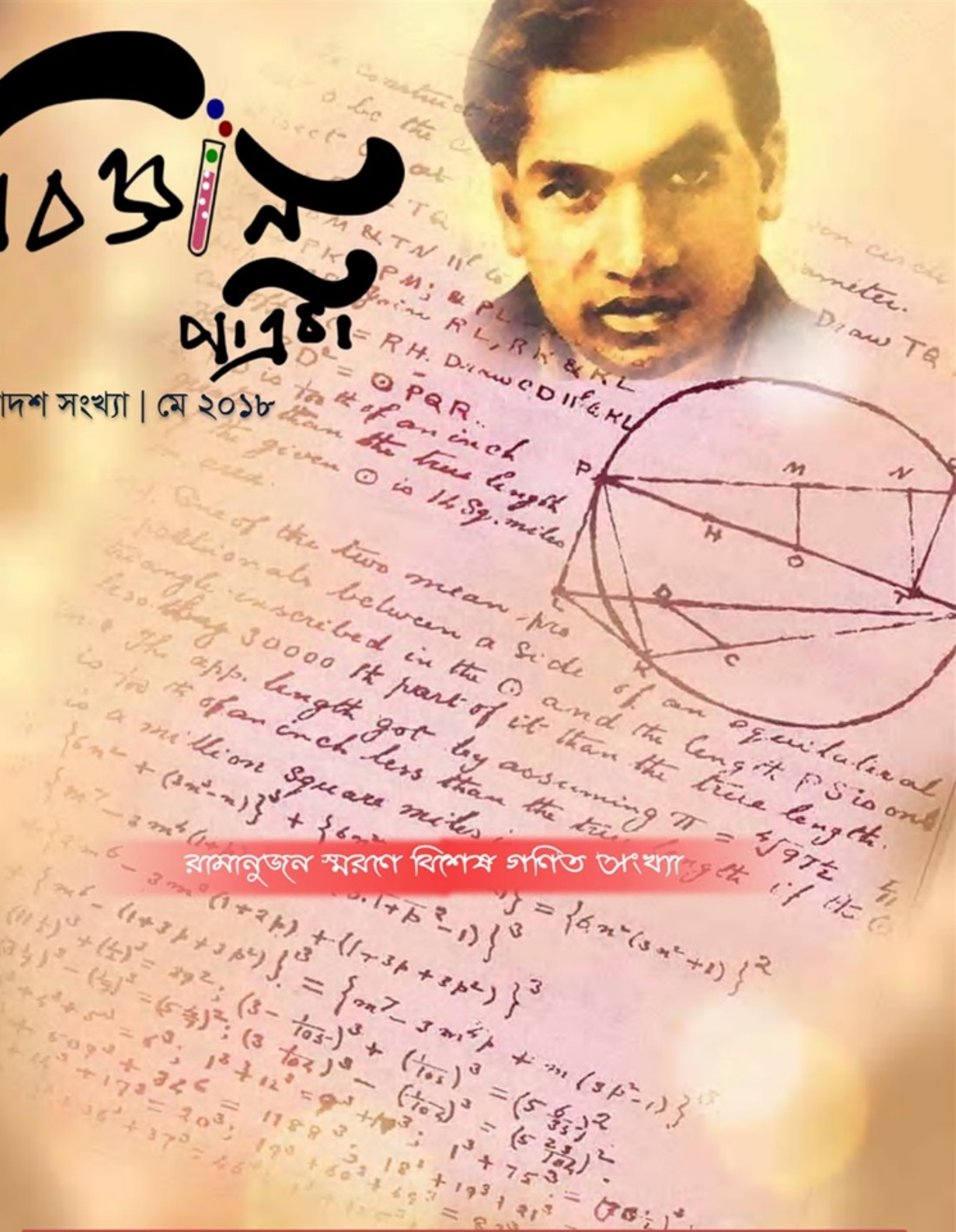

রামানুজন স্মরণে বিশেষ গণিত সংখ্যা

‘বিজ্ঞান’ (www.bigyan.org.in) – এর কিছু বাছাই লেখার সংকলন

একাদশ সংখ্যা । মে ২০১৮

রামানুজন স্মরণে বিশেষ গণিত সংখ্যা

‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ্যা ০৮

প্রফেসর এস. জি. দানি

বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতের গণিত ইতিহাসের ধারা বিভিন্ন গণিতবিদ ও ঘরানার অবদানের মাধ্যমে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় একটি সুস্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। কত প্রাচীন এই ইতিহাস? গণিতের কোন কোন শাখায় কি কি অবদান রেখে গেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা? একটি শতাব্দী থেকে আর একটি শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতের ক্রমবিকাশ ঠিক কি ভাবে হয়েছিল? এ রকম আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর আছে প্রফেসর এস. জি. দানি-র লেখা এই প্রবন্ধটিতে।

রামানুজন স্মরণে বিশেষ লেখা-১: রামানুজন সংখ্যা ১৭২৯

স্বর্ণেন্দু শীল

মৌলিক সংখ্যার মৌলিকতা ১৭

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

মৌলিক সংখ্যা কাকে বলে আমরা সবাই জানি। এখন প্রশ্ন হল কতগুলি মৌলিক সংখ্যা হয়? সেই সংখ্যা কি অসীম? যদি তোমাকে এক থেকে হাজারের মধ্যে সবকটা মৌলিক সংখ্যা দিয়ে দিই, তাহলে হাজারের থেকে বড় একটা মৌলিক সংখ্যা ঝটপট বানাতে পারবে কি? আর যদি বলি সমস্ত মৌলিক সংখ্যার যোগফল কত হবে? কিম্বা এই মৌলিক সংখ্যাগুলির অনোন্যকদের যোগফল কি অসীম? এই রকম নানান প্রশ্নের সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছে নীলাব্জ চ্যাটার্জী।

রামানুজন স্মরণে বিশেষ লেখা-২: হার্ডি রামানুজনের যুগলবন্দী

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

জ্যামিতির গোড়ার কথা : ইউক্লিড থেকে রিমান (২য় পর্ব) ২৫

স্বর্ণেন্দু শীল

সমান্তরাল সরলরেখার ধারণা আসে ইউক্লিডের বিখ্যাত পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ থেকে। ইউক্লিড ভেবেছিলেন এটা একটা উপপাদ্য যা প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সেই প্রমাণ করতে সময় লেগে গেছে প্রায় দু'হাজার বছর এবং সেই প্রমানের পথে তৈরি হয়েছে এক নতুন রকমের জ্যামিতি। না, সবটা এখানে বলা যাবে না। সুললিত ভাষায় এই গল্প শোনাবে স্বর্ণেন্দু শীল।

রামানুজন স্মরণে বিশেষ লেখা-৩: রামানুজনের ক্ষুরধার গণিত বুদ্ধি

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

পায়রার বাক্সে স্থান-সঙ্কুলান সমস্যা ৩০

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

প্রশ্ন হ'ল, পাঁচটি পায়রা চারটি খোপে কি ভাবে থাকবে?এবার কেউ বলতেই পারে, পায়রাদের সমস্যা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো কেন? সত্যি কথা বলতে কি পায়রারা তো আমাদের কাছে উত্তর জানতে চায় না। ওরা নিজেরাই সমাধান করে নেয়। কিন্তু ভাল করে দেখলে, এই সমস্যা আমাদের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয়, একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে কমপক্ষে এমন কতজন সদস্য থাকতে পারেন যাদের পরিচিতের সংখ্যা সমান? যদি অভ্যাগতদের সংখ্যা হয় হাজার বা তারও বেশী? আপাতভাবে আলাদা দুটো সমস্যার পিছনে রয়েছে একই সমাধানের সূত্র। নীলাব্জ চ্যাটার্জী বুঝিয়ে বলবে সেই কথা।

রামানুজন স্মরণে বিশেষ লেখা-৪: অসীম শ্রেণীর সসীম যোগফল

স্বর্নেন্দু শীল

পাইলাম এক ধাঁধা ৩৬

অমলেশ রায়

হ্যাঁ, এটা একটা মজার ধাঁধা। একটা গল্পের মধ্যে লুকিয়ে রাখা আছে একটি বিশেষ সংখ্যার মান। না না করেও একশ একটি সংখ্যামান একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আত্মগোপন করে আছে এই গল্পে। কি সেই সংখ্যা? কি ভাবে লুকিয়ে আছে এই গল্পে? একটু ভাবলেই পেরে যাবে তুমি। আর যদি না পারো তাহলে শেষ পাতায় উত্তর রইল। উত্তরের সঙ্গে অমলেশ রায়-এর কলমে সংখ্যা নিয়ে একটা অন্য রকমের ছড়াও পাবে।

রামানুজন স্মরণে বিশেষ লেখা-৫: মূলদের ভিতর মূলদ, তার ভিতরে মূলদ

স্বর্নেন্দু শীল

নুড়ি সরানোর খেলা ও গোল্ডেন রেসিও ৪০

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

ছেলেবেলায় খেলা নুড়ি সরানোর খেলা যারা খেলেছ বা দেখেছ, খেলা চলার সময় বুঝতে পারতে কি এই দানে কে জিততে পারে? খুব কঠিন মনে হচ্ছে নাকি! আসলে এটা কিন্তু খুব সহজ একটা সমস্যা। আর এই সমস্যার সমাধান জানতে হ'লে নীলাব্জ চ্যাটার্জী-র এই লেখাটি পড়তেই হবে।

সম্পাদকীয়

অঙ্ককে যারা বিদঘুটে আর বিচ্ছিরি বলে ভাবে, তাদের জন্য এবারের 'বিজ্ঞান পত্রিকা'। ইস্কুলের অঙ্ক, যেটা কেবল নিয়ম মেনে কিছু হিসেব কষা শেখায়, সেটাতে অঙ্কের পুরো চিত্র বা মজা কোনটাই পাওয়া যায় না। সত্যি বলতে কি মজা না পেলে সেই কাজ করতে মনও চায় না। এবারের বিজ্ঞান পত্রিকাতে অঙ্কের এমনি কিছু মজাদার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আচ্ছা গোলাপ বা সূর্যমুখী ফুল কেমন লাগে তোমাদের? কোনারকের চাকা বা মন্দির কিম্বা নিদেন পক্ষে তাজমহল? মনের মধ্যে ছবিগুলো ফুটে উঠছে তো? এগুলো যে খুব সুন্দর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আকৃতির দিক থেকে এদের সৌন্দর্যের সাথে অঙ্কের ওতপ্রোত যোগ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল: গোলাপ বা সূর্যমুখী ফুলে আবার অঙ্ক এলো কোথা থেকে? ভাল প্রশ্ন। খুব ভাল করে যদি দেখ তাহলে বুঝতে পারবে ওদের পাপড়ির সজ্জারীতি অনেক সময় অঙ্ক মেনে সাজানো থাকে (নিখুঁত হ'লে এগুলি ফিবোনাচ্চি সিরিজ মেনে চলে, শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে গাছের ডাল বা পাতার সজ্জারীতিও এই সিরিজ মেনে চলে)। তেমনই কোনারক বা তাজমহলও নিপুণ অঙ্কের স্বরূপ। অঙ্কের এই রূপটাই দেখতে পান গণিতজ্ঞরা। আর এক জন দেখতে পায়। সে হল 'পটাশগড়ের জঙ্গলে' অ্যালফাবেট সাহেবের কুটিরে অঙ্ক কষতে থাকা ছোট্ট ভুতু!

শুধু প্রকৃতিতে সংখ্যা নয়, সংখ্যারও মজার প্রকৃতি থাকতে পারে। গণিতজ্ঞরা এবং গণিত-উৎসাহীরা হঠাৎ-ই গণিতের একটা সম্পূর্ণ নতুন দিক আবিষ্কার করেন যখন এই প্রকৃতিগুলোর সম্মুখীন হন। আজ আমরা এমন একজন মানুষকে স্মরণ করবো যিনি প্রায় দিব্যচক্ষুতে সংখ্যার বিভিন্ন প্রকৃতি দেখতে পেতেন। গণিতের ইতিহাসে অজস্র প্রতিভার মাঝে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম শ্রীনিবাস রামানুজন। ওনার জীবনকাল ছিল সর্বসাকুল্যে ৩৩ বছর: জন্ম ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ অবিভক্ত ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর জেলায় এবং মৃত্যু ২৬শে এপ্রিল ১৯২০। কিন্তু তার মধ্যেই উনি সাড়া জাগিয়েছিলেন গণিতের জগতে। দুটো স্বীকৃতির কথা বললেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে (১৯১৮) মাত্র ৩১ বছর বয়সে 'রয়্যাল সোসাইটি'-র অন্যতম কনিষ্ঠ 'ফেলো' (সদস্য) নির্বাচিত হয় রামানুজন নামের যুবকটি। সেই বছর ১৩ই অক্টোবর প্রথম ভারতীয় হিসাবে তাঁকে লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজের 'ফেলো' নির্বাচিত করা হয়।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮, গোটা ইউরোপ তখন জ্বলছে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগুনে। সেই আবহাওয়ার মধ্যে রামানুজন ট্রিনিটি কলেজের হার্ডি নামক এক গণিতজ্ঞের সাথে পাড়ি জমিয়েছেন অঙ্কের 'অসীম' সমুদ্রে। সে এক অন্য জগত, যেখানে সংখ্যারা রূপ নেয় সমীকরণের, সমীকরণ দেখা দেয় ছবি হয়ে আর ছবিগুলো হয়ে ওঠে জীবন্ত। তবে প্রথাগত শিক্ষা ও সঠিক সময়ে সঠিক প্রশিক্ষণ না পাওয়ায় তার 'নোটবুক'-এ অনেক সময় যা দেখা যায়, তা আসলে পূর্ব আবিষ্কৃত কোনো সূত্র, যেমন অয়লার-এর সূত্র। অনেক সময় প্রমান ছাড়া সেই সূত্রগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করতেন তাঁর নোটবুকে। কি ভাবে একজন গণিতজ্ঞ প্রশিক্ষণ ছাড়াই এই সূত্রগুলিতে উপনীত হয়েছিলেন, তা আজও পণ্ডিতদের মনে বিস্ময় জাগায়। ট্রিনিটি কলেজের আর এক সমসাময়িক গণিতজ্ঞ লিট্‌লউড-এর মতে, প্রত্যেক ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সঙ্গে রামানুজনের ব্যাক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল।

রামানুজনের আবিষ্কারের মর্ম তৎকালীন ভারতের গণিতজ্ঞরা বুঝতে পারবেন না, এটা তাঁর কাছের বন্ধুরা বুঝেছিলেন। বন্ধুদের কথাতে রামানুজন চিঠি লিখলেন তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ জি. এইচ. হার্ডি-কে।

‘রতনে রতন চেনে’ বলেই হার্ডি নির্ভুল ভাবে রামানুজনের সেই নয় পাতার চিঠির মধ্যে একটা স্ফুলিঙ্গের আভাস অনুভব করেছিলেন। উনি রামানুজনের দেশ, ধর্ম বা প্রথাগত শিক্ষার অভাব-কে আমল দেননি। বরং তার ইংল্যান্ড-এ আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে একসাথে গবেষণা করতে পারেন। তারপর যা হয়েছিল, সেটা ইতিহাস। দুজনের যৌথ গবেষণার ফলে নাম্বার থিওরি, ম্যাথেমেটিক্যাল অ্যানালিসিস, ইত্যাদি গণিতের বিষয়ে অনেক বড় বড় ফলাফল খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেরিয়েছিল।

রামানুজনের ৯৮ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ওনাকে শ্রদ্ধা জানাতে ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র একাদশ সংখ্যা অঙ্কের লেখা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রামানুজন-এর কিছু কাজের নমুনা নিয়ে আলোচনা আছে এবারের পত্রিকাতে। যেমন: ১+২+৩+৪+... , এই সিরিজ-টার যোগফল কি? দেখানো যায় যে একভাবে যোগ করলে যোগফলটা -১/১২। বিশ্বাস হচ্ছে না তো? রামানুজনের এই সমাধানের আলোচনা আছে এখানে। আছে ১৭২৯ বা ‘ট্যাক্সি ক্যাব’ সংখ্যা খুঁজে পাবার ইতিহাস। আচ্ছা, ৩-কে কয় ভাবে দুটো (বা তার বেশী) ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল হিসাবে লেখা যেতে পারে? ১+১+১, ১+২ আর ৩, অর্থাৎ তিন রকম ভাবে। অর্থাৎ তিনটে পার্টিশান বা ভাগ আছে। সেই রকম ৭ কে লেখা যায় ১৫ রকম ভাবে। এবার যদি বলি ২০০-কে কত রকম ভাবে লেখা যায়? মোটামুটি একমাস হাতেকলমে গবেষণা করে জানা গেছে ৪ ট্রিলিয়ন (৪,০০০,০০০,০০০,০০০) ভাবে। রামানুজন আর হার্ডি একটা সমীকরণ লিখেছিলেন যেটার সাহায্যে একটা সংখ্যার কতগুলো পার্টিশান হয়, সেটা আনুমানিক বা অ্যাপ্রক্সিমেট হিসেব করা যায়। সে কথাও আছে এই দুই মলাটের মাঝে। এমন আরও অনেক মজার মজার অঙ্ক আছে এবারের ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র একাদশ সংখ্যায়।

এছাড়াও আছে ‘বিজ্ঞান’ ওয়েবসাইট-এ পূর্বপ্রকাশিত অঙ্ক নিয়ে বাছাই কয়েকটি লেখা। যেমন, প্রাচীন ভারতের গণিতের ইতিহাস নিয়ে এক মনগ্রাহী আলোচনা করেছেন প্রফেসর এস জি দানি। বৈদিকযুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন গণিতজ্ঞদের অবদান ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই লেখাটিতে। বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে থেকে এই লেখা আমাদের পূর্বসুরিদের সম্পর্কে অতিরঞ্জিত গল্পগুলিকে প্রশ্ন করতে শেখায়।

অঙ্ক শিখতে গিয়ে প্রায় শুরুর দিকেই আমরা শিখি বিভাজ্যতার নিয়ম আর তার সাথেই সাথেই আসে মৌলিক সংখ্যা। পর পর কয়েকটা মৌলিক সংখ্যা বলতে বললে সহজেই পারবে: ২, ৩, ৫, ৭, ১১,...। কিন্তু এর শেষ কোথায় বা আদৌ শেষ আছে কিনা, সেটা বলা যায় কি? ‘মৌলিক সংখ্যার মৌলিকতা’ লেখাটিতে এই প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

এরপর ধরা যাক একটা বিয়েবাড়ির কথা। কখনও ভেবে দেখেছো কমপক্ষে এমন ক’জন ব্যক্তি থাকতে পারে যাদের পরিচিতদের সংখ্যা সর্বদা সমান? দুজন, পাঁচজন, দশজন নাকি আরও বেশী? এই প্রশ্নটার একটা মজার উত্তর পাবে ‘পায়রার বাক্সে স্থান সঙ্কুলান সমস্যা’ লেখাটিতে। পরের বারে বিয়েতে নেমন্তন্নখেতে গিয়ে এই প্রশ্ন করে একটা আসর মাত করে দিতে পারো কিন্তু।

এবার আসি একটা খেলার কথায়। ছেলেবেলায় অনেকে নুড়ি সরানোর খেলা খেলেছ হয়তো। সেই খেলাটার মধ্যেও একটা অঙ্ক লুকিয়ে আছে। যদি তুমি অঙ্কটা জেনে যাও তাহলে তক্ষুনি জেনে যাবে এই দানে কে

জিতবে। খুব সহজ এই অঙ্কটা যদি শিখতে চাও তাহলে “নুড়ি সরানোর খেলা ও গোল্ডেন রেসিও” লেখাটি পড়তে হবে।

আর আছে একটা ধাঁধা। একটা ছোট্ট গল্পের (১২-১৪ লাইন) মধ্যে লুকিয়ে রাখা আছে একটা বিশাল সংখ্যার ১০১ পর্যন্ত মান। আমাদের বিশ্বাস একটু মন দিয়ে দেখলেই পেয়ে যাবে সংখ্যাটা। তাহলে আর কি, মাথাটা একটু ঘামাও। না পারলে শেষে উত্তর দেওয়া আছে, তবে চেষ্টা না করে উত্তর দেখোনা কিন্তু। কৌতূহল রাখার জন্য বলে রাখি এই উত্তরের সঙ্গে পাবে একটা মজাদার অঙ্কের ছড়া।

রয়েছে “জ্যামিতির গোড়ার কথা : ইউক্লিড থেকে রিমান” –এর ২য় পর্ব। এবারের পর্বটা ইউক্লিড-এর বিখ্যাত পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ নিয়ে: যার থেকে সমান্তরাল সরলরেখা বা প্যারালাল লাইন-এর ধারণাটা আসে। এটা কি সত্যিই স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ প্রমানের অপেক্ষা রাখে না? এটাও একটা ধাঁধা বৈকি!

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র একাদশ সংখ্যা শুধু গণিত নিয়ে। সেই বিস্ময় প্রতিভা রামানুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মরণে। ছেলেবেলায় শুনেছিলাম, তুমি যদি অঙ্ক থেকে এক পা পিছিয়ে যাও অঙ্ক তিন পা পিছিয়ে যাবে আর যদি এক পা এগিয়ে আসো তাহলে সে সাত পা এগিয়ে আসবে। হিসাব কষে দেখলাম এগিয়ে আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তোমরাও এগিয়ে আসো, আর বাকিদেরকেও এগিয়ে আসতে উৎসাহিত কর। এই ‘বিজ্ঞান’ হ’ল ‘যারা ভালবাসে বা ভয় পায় তাদের জন্য’।

সম্পাদকমণ্ডলী, ‘বিজ্ঞান’
মে ২০১৮

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ড্রেসডেন, জার্মানী)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল (ক্যাপজেমিনাই, কলকাতা)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (রাদারফোর্ড আপেলটন ল্যাবরেটরি, ইউনাইটেড কিংডম)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- স্বাগতা ঘোষ (বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা)
- কৌশিক দাস, অধ্যাপক, মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টার্ণ শোর (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)

এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অনেক বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

কারিগরী সহযোগিতা – ঋত্বিক পাল (Pixel Poetics)

‘বিজ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র লোগোর মূল ভাবনা – নীলাঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা’-র সম্পাদনা – অমলেশ, সূর্যকান্ত, নীলাব্জ, কুণাল, অনির্বাণ, ও রাজীবুল।

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ

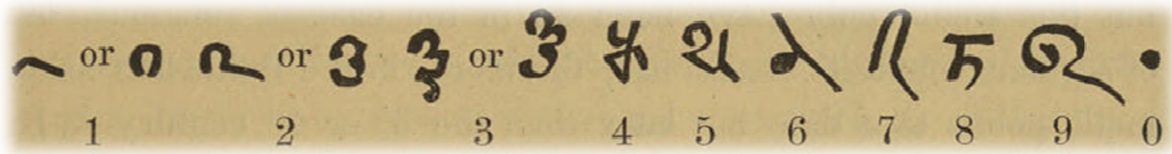

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ্যা

এস. জি. দানি

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ্যা নিয়ে আমি বিভিন্ন পেশার লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় প্রায়শই 'বৈদিক গণিতবিদ্যা'র '১৬ সুত্রের' কথা উঠে এসেছে। অনেকেই মনে করেন যে গণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন এই সূত্রগুলি আমাদের এক ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা বা ম্যাজিকাল পাওয়ার প্রদান করে। বাস্তব কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এই 'বৈদিক গণিতবিদ্যা' আসলে বৈদিক যুগের নয়, এগুলি সন্দেহাতীতভাবে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। 'ষোড়শ সূত্র' প্রকৃতপক্ষে প্রবর্তন করেন ভারতী কৃষ্ণ তীর্থজী, যিনি ১৯২৫ সাল থেকে আমৃত্যু (১৯৬০ সাল পর্যন্ত) পুরীর শঙ্করাচার্য ছিলেন। এর সঙ্গে তিনি আরও কিছু পাটিগণিত ও বীজগণিতের নিয়ম প্রণালীও প্রবর্তন করেন। অতএব, এইসব 'সূত্র' বা গণিতের নিয়ম প্রণালীর সঙ্গে বেদ বা বেদ পরবর্তী ভারতবর্ষের গাণিতিক ঐতিহ্যের কোন যোগাযোগ নেই। বৈদিক গণিতের নামে শিশুদের যা শেখানো হয় তার মাধ্যমে প্রাচীন ঋষিদের অতি-প্রাকৃত ব্যক্তিত্বকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই 'বৈদিক গণিত' সম্পূর্ণভাবে কিছু শব্দবন্ধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, আধুনিক সংস্কৃত শৈলীতে যা 'সূত্র' নামে পরিচিত। এর কোন বিশ্বাসযোগ্যতা আছে বলে মনে হয়না। অথচ, বৈদিক গণিত নিয়ে এই হইচইকে একটা রসিকতা বলেও আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানকালে যে ধরনের বাতাবরণে এই হইচই সফল হচ্ছে তার মূলে প্রাচীনকালের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা অন্যতম। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে দীর্ঘ ৩০০০ বছরের প্রয়াস ও গণিততত্ত্বের সাধনার ঐতিহ্যকে জনসাধারণের এক বড় অংশ বুঝেছে খুবই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এর অনেকটা মনগড়াও বটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি গণিতবিদ্যার প্রতি আমাদের এক চরম উদাসীনতার পরিচায়ক।

প্রাচীন ভারতের সাফল্য সম্পর্কে যে আমাদের প্রচণ্ড অবহেলা জড়িত, তা কিন্তু নয়। বরঞ্চ উলটোটাই সত্যি। অনেক জনপ্রিয় ও তথ্যপূর্ণ রচনা পাওয়া যাবে যেখানে অযৌক্তিকভাবে আমাদের পূর্বপুরুষদের অপরিসীম জ্ঞানের কথাই দাবি করা হয়েছে। অথচ, পরিশীলিত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান বা সাফল্যকে আমরা খুব কম ক্ষেত্রেই বাস্তবসম্মতভাবে অনুধাবন বা উপলব্ধি করতে পেরেছি। ঔপনিবেশিক যুগে কিছু পশ্চিমী শিক্ষাবিদের পক্ষপাতিত্বের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছিল । সেই সময়ে প্রতিকূল প্রচারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাগিদ ছিল প্রবল। কিন্তু এই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার যে গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তা সহজলভ্য ছিল না। তাই প্রায়শই সহজ পন্থা

অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে তথ্যের থেকে বক্তৃতার প্রগল্‌ভতাই প্রাধান্য পেয়েছে। যাইহোক, সেই সময় সুধাকর দ্বিবেদীর মতো কিছু ভারতীয় শিক্ষাবিদও ছিলেন, যাঁরা জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে আশ্রয় করেছিলেন। যদিও তাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এখন আমরা ঔপনিবেশিক যুগকে অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছি। সারা পৃথিবী ভারতের সাফল্যকে যথেষ্ট কৌতূহল ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। তাও, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পুরানো চিন্তাভাবনার আলোচনা ও নিবন্ধ এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমার মনে হয়,এখন সময় হয়েছে সার্বভৌম এবং বুদ্ধিগতভাবে স্বনির্ভর সমাজের মানানসই পথ অবলম্বন করার। 'তাঁরা কি বলেছিলেন' আর কেমনভাবে 'আমরা আমাদের জাহির করব' – চিন্তাভাবনার এই পরিকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যপূর্ণ অধ্যয়ন এবং সমালোচনামূলক মূল্যায়নের ওপর জোর দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময় । প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর গণিতবিদ্যার ঐতিহ্যে প্রাচীন ভারতের অবদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। গত ৩০০০ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে গণিতবিদ্যার যে অগ্রগতি ঘটেছে, বহু অংশে আমাদের দেশ তার সাক্ষী থেকেছে। বাকি বিশ্বের সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তুলে ধরেছে। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে পড়েছি আমরা, বিশেষত সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে। এই প্রবন্ধে এমনই কিছু বুদ্ধিগত প্রচেষ্টার আকর্ষণীয় ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে যা প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ গণিতবিদ্যার পরিকাঠামো গঠন করেছিল।

ভারতবর্ষে গণিতবিদ্যা চর্চার যে ঐতিহ্য তা বুঝতে গেলে অন্ততপক্ষে আমাদের বেদের যুগে ফিরে যেতে হবে। বেদের সূত্রগুলোতে রয়েছে আধ্যাত্মিক থেকে বৈষয়িক, জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আলোচনা। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র ও ব্যাপ্তি সত্ত্বেও যেটা সহজে নজরে আসে তা হল বড় সংখ্যার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। যেহেতু সে যুগে শিক্ষার প্রসার মূলত ঘটেছিল মৌখিকভাবে, তাই সংখ্যার লিখিতরূপ ছিল না। কিন্তু সংখ্যাগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে ১০ এর বিভিন্ন ঘাত (combination of powers of 10) ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এটা ভাবা যুক্তিযুক্ত হবে যে, পরে যখন লিখিত সংখ্যার ক্ষেত্রে দশমিক পদ্ধতির প্রচলন শুরু হল, তার অনেকটাই পুরানো বৈদিক সূত্রের এই ধারা অনুসরণ করে এসেছিল।

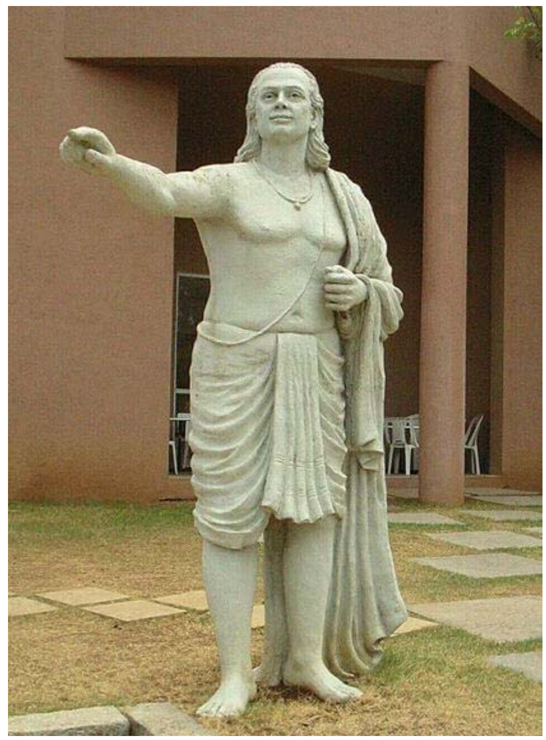

আর্যভট্ট ভারতীয় বিজ্ঞানসম্মত জ্যোর্তিবিদ্যার জনক হিসাবে পরিচিত

(ছবির সূত্র - উইকিমিডিয়া)

খ্রীষ্ট পরবর্তী শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে ভারতবর্ষে '0' এর ব্যবহারের সঙ্গে দশমিক পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল। পারস্য আর আরবের মাধ্যমে তা

ছড়িয়ে পড়েছিল পশ্চিমের দেশগুলিতে। যদিও এর আগেই দশমিক পদ্ধতির বেশ কিছু অংশের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্যাবিলনীয়, চীনা, মায়ার মতো প্রাচীন সভ্যতাতে। দশমিক পদ্ধতির সাহায্যে স্বাভাবিক সংখ্যার (Natural number) প্রকাশ (representation) কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে তার বর্তমান বহুল প্রচলিত রূপ পেয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ভগ্নাংশের ব্যবহার সংখ্যাতত্ত্বের একটি অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছিল, যদিও এর মধ্যে আরবকে জড়িয়ে কিছু মধ্যবর্তী ইতিহাস আছে। সংখ্যাতত্ত্বের অগ্রগতি গণিতবিদ্যার উন্নতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ধাপ এবং সার্বিকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য। সংখ্যাতত্ত্বের এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে কোনো মতবাদ বা ধারণার (Idea) অগ্রগতির পিছনে রয়েছে বহু যুগে বহু মানুষের অবদান। এটি একটি সর্বব্যাপী (inclusive) ঘটনা। এই অগ্রগতিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের সাথে আমাদের যোগসূত্র আছে বলে আনন্দ ও গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু, সেই সাথে অন্যদের ভূমিকাও উপলব্ধি করা দরকার।

এটা সর্বজনবিদিত যে বৈদিক যুগে যজ্ঞের বেদী নির্মাণের অনুষঙ্গে জ্যামিতির চর্চা হত। ‘শুল্ব সূত্রে’ (Sulvasutra) বেদী নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখানে বিভিন্ন জ্যামিতিক তত্ত্বের ওপরও আলোকপাত করা আছে। এইগুলি রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে। সবচেয়ে প্রথমে রচিত হয়েছিল ‘বৌধায়ন শুল্ব সূত্র’ (Baudhayana Sulvasutra), খ্রীষ্টপূর্ব আট শতাব্দীতে। এর কিছু পরেই ‘ইউক্লিডিয়ান (Euclidean) জ্যামিতি’ গ্রীকদের দ্বারা প্রণীত হয় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির মত এতটা এগোতে না পারলেও ‘শুল্ব সূত্র জ্যামিতি’ ভারতবর্ষে জ্যামিতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। অনেক বিষয়ের মধ্যে এই শুল্ব সূত্রের জ্যামিতিবিদরা পরিচিত ছিলেন ‘পীথাগোরাসের সূত্র’-এর সাথে – পীথাগোরাসের জন্মের দুশো বছরেরও আগে! প্রধান চারটি শুল্ব সূত্রের প্রতিটাতেই ‘পীথাগোরাসের সূত্র’-এর স্পষ্ট বর্ণনা আছে। এই জ্যামিতিবিদরা তাঁদের তৈরি জ্যামিতির কাঠামোর মধ্যেই আলোচনা করেছিলেন কীভাবে একটি বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করা যায়, বা এর উলটোটাও। ২-এর বর্গমূলের আসন্নমান নির্ণয়ের কাজও তাঁরা যথেষ্ট ভালভাবে করেছিলেন।

যদিও এটা সাধারণত স্বীকৃত হয়না, শুল্ব সূত্র জ্যামিতির নিজেরই বিবর্তন হচ্ছিল। এখনো বেঁচে থাকা চারটি মুখ্য সূত্রের উপাদানের পার্থক্য থেকে এটা দেখা যায়। কিছু সংশোধন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মতো শুল্ব সূত্রের প্রথম যুগে মনে করা হত বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হল ৩, যেটা বৌধায়ন সূত্রে (Baudhayanasutra) দেখা গেছে। কিন্তু মানব (Manava) সূত্রে একটি নতুন মান প্রস্তাবিত হয়, যা ৩ পূর্ণ ১/৫ এর সমান। মজার বিষয় হল, এই সূত্রটি শেষ হচ্ছে একটা বিজয়বার্তা দিয়ে যে এই নতুন মান সমস্যাটির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। যদিও এই নতুন প্রস্তাবিত মানটিও সঠিক নয়, কিন্তু সূত্রগুলির মধ্যে যে অগ্রগতি ঘটছিল, এটি তার সন্তোষজনক উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বৌধায়ন সূত্রে একটি বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত খুঁজে বের করার জন্য যে পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, ‘মানব শুল্ব সূত্র’

(Manava Sulvasutra)-র বিবরণে সেই পদ্ধতিরও উন্নতিসাধন হয়েছে।

আমাদের দেশের গণিতবিদ্যার অগ্রগতির ইতিহাসে জৈন মতবাদও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক পণ্ডিতদের মতো জৈনদের গণিতবিদ্যা অধ্যয়নের প্রেরনা ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম পালন থেকে আসেনি, কারণ ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি জৈনদের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। তাঁদের প্রেরণা ছিল বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গভীর অনুশীলন। জৈনরা বিস্তৃতভাবে মহাবিশ্বের মানচিত্র রচনা করেছিলেন যেখানে গণিতবিদ্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল। এমনকি জৈন দর্শনেও অনেক ক্ষেত্রে গাণিতিক আলোচনার প্রতিফলন দেখা যায়। জৈনদের প্রথম দিকের গবেষণার মধ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল বৃত্তের জ্যামিতি, ১০-এর বড় ঘাতযুক্ত সংখ্যার (numbers with large powers of 10) পাটীগণিত, বিন্যাস ও সমন্বয় (permutations and combinations) এবং অসীমের (Infinity) শ্রেণীবদ্ধকরণ (অসীম যে অনেকরকম হতে পারে সেটা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন)।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শুল্ব সূত্রের মতোই জৈনরাও বুঝতে পারেন যে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ৩ নয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত একটি জৈন রচনা 'সূর্যপ্রজ্ঞাপ্তি'তে (Suryaprajnapti) রচয়িতা এই অনুপাতের প্রথাগত মান '৩' কে সংশোধন করে নতুন মান হিসাবে '১০ এর বর্গমূল' কে প্রস্তাবিত করেন, যা প্রকৃত মানের অনেকটাই কাছাকাছি। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের এই মান দীর্ঘদিন ধরে ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল এবং প্রায়শই 'জৈন মান' হিসাবে উল্লেখ করা হত। আর্যভট্ট এই অনুপাতের সুপরিচিত মান '৩.১৪১৬' প্রবর্তন করার পরেও অনেকদিন পর্যন্ত এই 'জৈন মান' ব্যবহৃত হয়েছে। বৃত্তচাপকে (circular arc) তার অনুরূপ জ্যা (chord) ও তার উচ্চতা (height over the chord) দিয়ে প্রকাশ করার সূত্র এবং একটি বৃত্তচাপ ও তার দুটি জ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত অঞ্চলের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্রের মতো কিছু অনন্য সূত্রও জৈন রচনাবলীতে পাওয়া যায়। যদিও কলনবিদ্যার (Calculus) আবির্ভাবের পরেই এই সমস্ত রাশির সঠিক মান নির্ণয়ের পদ্ধতি পাওয়া গেছে, কিন্তু প্রাচীন জৈন পণ্ডিতরা কি ভাবে এই সমস্ত সূত্রের কথা বলেছেন যা আসন্ন মানের খুব কাছাকাছি সেটা এখনো গবেষণার বিষয়।

কিছু শতাব্দী স্তিমিত থাকার পর, প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমাংশে সুস্পষ্ট গাণিতিক কার্যকলাপ জৈন সংস্কৃতিতে আবার দেখা যায় অষ্টম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীরের লেখা 'গণিতসারসংগ্রহ' অন্যতম সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী রচনা। বীরসেনা (৮ম শতাব্দী), শ্রীধর (৮৫০-৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে), নেমিচন্দ্র (৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের আশেপাশে), থাক্কুরা ফেরু (১৪শ শতাব্দী) প্রমুখের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামীয় সভ্যতা ও স্থাপত্য (architecture) ভারতে শিকড় গাড়তে শুরু করে। থাক্কুরা ফেরু, যিনি দিল্লীর খিলজি সুলতানের দরবারের একজন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর রচিত 'গণিতসারকৌমুদী'তে স্থানীয় জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে ইন্দো-পারসিয়ান সাহিত্যের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি বাসস্থান নির্মাণের জন্য গম্বুজ, খিলান বা তাঁবুর মতো যে বিভিন্ন ধরনের গাঁথনি তৈরি হতো সেগুলির ক্ষেত্রফল ও আয়তন গণনার ক্ষেত্রেও এই সংমিশ্রণ দেখা যায়।

গাণিতিক জ্যোর্তিবিদ্যা অথবা 'সিদ্ধান্ত'র ধারাগুলি ভারতীয় গণিতের প্রভাবশালী এবং কালজয়ী ঐতিহ্য। সাত শতক ধরে চলতে থাকা এই নিরন্তর উন্নয়ন ভারতীয় বিজ্ঞানসম্মত জ্যোর্তিবিদ্যার জনক হিসাবে পরিচিত আর্যভট্ট (৪৭৬-৫৫০ খ্রিঃ) থেকে দ্বিতীয় ভাস্কর (১১৪-১১৮৫ খ্রিঃ), এবং তাঁরও পরে আরও অনেকের অবদানের ফসল। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা দেখা যায় আর্যভট্টের পরে অনেক শতাব্দী ধরে বিশিষ্ট সব নামের দীর্ঘ তালিকায় : ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির, সপ্তম শতকে প্রথম ভাস্কর ও ব্রহ্মগুপ্ত, নবম শতকে গোবিন্দগোস্বামী ও শঙ্করনারায়ণ, দশম শতকে দ্বিতীয় আর্যভট্ট ও বিজয়ানন্দী, একাদশ শতকে শ্রীপতি, দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেব ও দ্বিতীয় ভাস্কর, এবং চতুর্দশ ও ষোড়শ শতকে যথাক্রমে নারায়ণ পণ্ডিত ও গণেশ।

এই ঐতিহ্য, এমনকী পরবর্তীকালে কেরালার মাধব ঘরানার গবেষণার (যা আমি পরবর্তীকালে আলোচনা করব) পিছনেও মূল গ্রন্থ হ'ল ৪৯৯ সালে লেখা 'আর্যভটীয়'। এটিতে ১২১ টি চরণ (verse) চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত যথা, গীতিকাপদ, গণিতপদ, কালক্রিয়াপদ ও গোলপদ। প্রথম অধ্যায়, যা সৃষ্টিতত্ত্বের (cosmology) আলোচনা করে, যেখানে একটি শ্লোক পাওয়া যায় যা বৃত্ত চাপের ২২৫ মিনিট ব্যবধানে ২৪ টি জ্যা পার্থক্যের ছক/তালিকা বর্ণনা করে। দ্বিতীয় অধ্যায় (গণিতপদ), নামের সাথে প্রত্যাশিতভাবেই সম্পূর্ণ গাণিতিক বিষয়ে নিবদ্ধ যেখানে বর্গমূল ও ঘনমূল, পাই (π) -এর আসন্ন মান (৩.১৪১৬ দশমিক মান পর্যন্ত), বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারের ক্ষেত্রফল ও আয়তনের সূত্র, পরপর পূর্ণসংখ্যা ক্রমের যোগফলের সূত্র, বর্গফলের যোগ, ঘনফলের যোগ, এবং সুদের হিসাব প্রভৃতি নির্ধারণের নিয়ম বিষয়ে আলোচনা আছে। অবশিষ্ট দুই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় জ্যোর্তিবিদ্যা, গ্রহগুলির দূরত্ব ও পারস্পরিক গতি, গ্রহণ ইত্যাদি।

ব্রহ্মগুপ্তের লেখা 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' (ব্রহ্মার সংশোধিত নীতিমালা) একটি বিশাল বই, বিশেষত সেই সময়ের বইগুলোর তুলনায়। এটি সিদ্ধান্ত জ্যোর্তিবিদ্যার উপর, এবং দ্বাদশ ও অষ্টাদশ এই দুটি অধ্যায়ে ছিল বিভিন্ন গাণিতিক বিষয়। একাদশ অধ্যায়টিতে 'আর্যভট্টীয়' সহ পূর্ববর্তী কাজের সমালোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সুস্থ বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মতই এই সময়ের গাণিতিক গবেষণার ঐতিহ্যেও একাধিক, কখনও বা তিক্ত, বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ অধ্যায় ঋণাত্মক সংখ্যা সহ পাটিগণিতের নিয়মগুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবহারের জন্য পরিচিত। দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঋণাত্মক সংখ্যার ধারণা ইউরোপের কাছে পরিষ্কার ছিল না। এই অধ্যায়টিতে জ্যামিতি সহ তাঁর বিখ্যাত বৃত্তীয় চতুর্ভুজের[১] (cyclic quadrilateral) ক্ষেত্রফলের সূত্রের বর্ণনা আছে (দুর্ভাগ্যবশত পরের কয়েকশো বছরে এই বিষয়ের উপর যাঁরা গবেষণা করেছিলেন তাঁরা এই সূত্রের আলোচনায় "বৃত্তীয় শর্ত"-এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি, যা পরবর্তীকালে গণিতজ্ঞদের কাছে সমালোচিত হয়েছে)। অষ্টাদশ অধ্যায় কুট্টক ও অন্যান্য প্রণালীর জন্য নিবেদিত যেখানে দ্বি-মাত্রিক অনির্ণীত সমীকরণের (second-degree indeterminate equations) সমাধানও আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্মগুপ্ত $\mathbf{dx^2 + a = y^2}$ জাতীয় সমীকরণের সমাধান নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, যেখানে x, y, a, d পূর্ণসংখ্যা এবং d পূর্ণবর্গ নয়, যা বর্তমানে পেল (Pell)-এর সমীকরণ নামে খ্যাত। এই জটিল প্রশ্নটি, যা সংস্কৃতে ভার্গ প্রকৃতি নামে পরিচিত ছিল, তা বহু শতক ধরে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের অনেক প্রজন্মকে ভাবিয়েছে। অবশেষে জয়দেব একাদশ শতকে এর সমাধান

করেন এবং পরবর্তী কালে দ্বিতীয় ভাস্কর এটির সম্প্রসারণ করেন 'চক্রবাল' নামক পদ্ধতির সাহায্যে। ব্রহ্মগুপ্ত নিজে কিছু ক্ষেত্রে এর সমাধান করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যদি এই সমীকরণের একটি সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাহলে তার অসীম সংখ্যক সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এই সমাধানের পিছনে একটি অভিন্নতা (identity) ব্যবহার করেছিলেন তিনি, যা বর্তমান গণিতেও ব্যবহৃত হয় 'ব্রহ্মগুপ্ত অভিন্নতা' হিসাবে। এগুলি ছাড়াও একবিংশ অধ্যায়ের স্তবকে ত্রিকোণমিতির আলোচনা আছে। 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত' আরব দুনিয়াকে এবং তাদের মাধ্যমে পরবর্তীকালে ইউরোপের গণিত চর্চাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

দ্বিতীয় ভাস্কর ছিলেন 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত' নামের বিখ্যাত গাণিতিক বই দু'টির লেখক। একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ছাড়াও তিনি ছিলেন মহান শিক্ষক এবং গণিতের প্রচারক। 'লীলাবতী'-র আক্ষরিক মানে হল হাসিঠাট্টাময় (playful), এবং এই বইতে কৌতুকের ছলে অঙ্ককে পরিবেশনা করা হয়েছে। এর অনেকগুলো চরণ সরাসরি এক কম বয়সী সুন্দরী মেয়েকে সম্বোধন করে লেখা, এবং উদাহরণগুলি বিভিন্ন প্রাণী, গাছপালা ও অলঙ্কারের (ornament) মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। (প্রচলিত আছে যে লেখক এই বইটির নামকরণ করেছিলেন নিজের মেয়ের নামে, যখন একটি জলঘড়ির ভুলের কারণে তার বিয়ে ভেঙ্গে যায়। যদিও এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।) গ্রন্থটিতে প্রাথমিক পাটিগণিত, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের জ্যামিতি, পীথাগোরাসের সূত্রের প্রয়োগের উদাহরণ, ত্রৈরাশিক, কুট্টক পদ্ধতি, বিন্যাস ও সমবায়ের সমস্যার উপরে আলোচনা আছে। 'বীজগণিত'বইটিতে বীজগণিতের উচ্চ স্তরের আলোচনা রয়েছে, যা ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ধরণের প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টা। অজ্ঞাত রাশির সাথে অপারেশন (operation), কুট্টক ও চক্রবাল পদ্ধতির দ্বারা অজানা সমীকরণের সমাধান এই রকম আরো কিছু বিষয় উদাহরণ সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। ভাস্করের জ্যোতির্বিদ্যার ওপর লেখা 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' ও 'করণ কুতূহলের' মধ্যে ত্রিকোণমিতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এবং ক্যালকুলাসের (কলনবিদ্যা) মত কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

'সিদ্ধান্ত' পরম্পরার অনেক গবেষণাই পরবর্তীকালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকেই এর ওপর টীকা-টিপ্পনী করেছেন। এদের মধ্যে গত শতাব্দীর অনেকে কাজ আছে, সেই সাথে কোলব্রুকের (Colebrook) মত ইউরোপীয় লেখকদের কাজ এবং সুধাকর দ্বিবেদী, কুপ্পান্না শাস্ত্রী ও কে ভি শর্মার মত আরো অনেক ভারতীয়দের কাজও উল্লেখ্য। দত্ত ও সিং–এর লেখা দুই খন্ডের বই এবং সরস্বতী আম্মার লেখা বই এই ধরণের বহু ফলাফলের জন্য সুবিধাজনক রেফারেন্স। কিম প্লোফকারের নতুন বইতেও নানা বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ সহ পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস অধ্যয়নে ৭০টি ভূর্জপত্র (বার্চ গাছের ছাল) সম্বলিত বক্ষালী পাণ্ডুলিপি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যদিও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। ১৮৮১ সালে পেশোয়ারের কাছে একটি জমিতে খনন কালে এক চাষি এই পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। ভারততত্ত্ববিদ এ এফ আর হর্নলি (A. F. R. Hoernle) বইটি জোগাড় করে পড়েন এবং এটির বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। পরে পাণ্ডুলিপিটি অক্সফোর্ডের বডলিয়ান গ্রন্থাগারে (Bodleian Library) দান করেন এবং তখন থেকে সেটি ওখানেই আছে। ১৯২৭ সালে

কেয় (Kaye) ভূর্জপত্রগুলির অনুলিপি (fascimile copies) করেন। অনুলিপিগুলি এই বিষয়ে গবেষণার মূল উৎস হয়ে ওঠে। প্রথম থেকেই গ্রন্থটির রচনা কাল নিয়ে বিতর্ক আছে, আনুমানিক সময়কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি হতে পারে। তাকাও হায়াশির (Takao Hayashi) মতামত এ ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, ইনি এটির রচনাকাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলে চিহ্নিত করেন, কিন্তু এর গাণিতিক বিষয় খুব সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর। যদিও তেজস্ক্রিয় কার্বন দিনাঙ্ক (radio carbon dating) দ্বারা এর মীমাংসা সম্ভব কিন্তু এখনো তা করা হয়ে ওঠেনি।

পাণ্ডুলিপিতে থাকা বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয়ের একটি সূত্র প্রভৃত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বক্ষালী পাণ্ডুলিপির আর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট এখানে গণনাগুলিতে বড় বড় সংখ্যার ব্যবহার (দশমিক উপস্থাপনায়)।

অবশেষে আমরা আলোচনা করব কেরালা ঘরানার কথা। ১৮৩০ সালে চার্লস হুইশ নামে মাদ্রাজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্ট মধ্য কেরালার (বর্তমানের কোজিকোড়ে থেকে কোচি) প্রাচীন গণিত ঘরানা থেকে এক পাণ্ডুলিপি সংকলন সবার গোচরে আনেন। দীর্ঘ শিক্ষক-ছাত্র পরম্পরার এই গণিতচর্চার ঘরানাটি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছরের বেশী স্থায়ী ছিল। মাধবের সময় থেকে এর শুরু বলে মনে করা হয় এবং পরবর্তী লেখকরাও তাঁকেই বহু গবেষণার কৃতিত্ব দিয়ে গেছেন। মাধব ছাড়াও নীলকণ্ঠ সোময়াজি হলেন এই ঘরানার আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে মাধবের গণিত সংক্রান্ত অবদানের মূল উৎসগুলি আর কিছু অবশিষ্ট নেই (যদিও কিছু জ্যোর্তির্বিদ্যার কাজ এখনো আছে)। নীলকণ্ঠ ১৫০০ সালে 'তন্ত্রসংগ্রহ' (সংস্কৃতে) নামে একটি বই লেখেন। এই ঘরানা থেকে বহু ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে শঙ্করের লেখা 'যুক্তিদীপিকা' ও 'ক্রিয়াক্রমকারী' এবং মালয়ালম ভাষায় জ্যেষ্ঠদেবের লেখা 'যুক্তিভাষা' উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বহু ভারতীয় গবেষক এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষণ করেছেন। কে ভি শর্মা একটি সম্পাদিত অনুবাদ প্রকাশ করেন যেটি বর্তমানকালে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সহকারে কে রামসুব্রহ্মণ্যম, এম ডি শ্রীনিবাস এবং এম এস শ্রীরাম প্রকাশ করেন। সম্প্রতি কে রামসুব্রহ্মণ্যম ও এম এস শ্রীরাম 'তন্ত্রসংগ্রহ'র একটি অনুবাদ সম্পাদনা করেন।

কেরালার গণিত চর্চা অতীত বিশ্বের যেকোন স্থানের তুলনায় একটি উচ্চ পর্যায়ে উন্নিত হয়েছিল। যদিও এখানে উল্লেখ্য যে চৈনিক গবেষণাও কিছু কৃতিত্বের দাবিদার, যা অবশ্যই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। কেরালার অবদান π-এর ক্রম সম্প্রসারণ ও চাপ-স্পর্শক ক্রম এবং সাইন ও কোসাইন (sine and cosine) অপেক্ষকের ক্রম নির্ণয় যা প্রায় দুই শতাব্দী পরে ক্রমানুসারে জর্জ, লিবনিজ ও নিউটনের হাত ধরে ইউরোপে প্রকাশিত হয়। π-এর একাদশ দশমাংশ পর্যন্ত সঠিক সংখ্যাগত মান এই কাজ গুলির অন্যতম অবদান। অনেক ভাবেই কেরালার গণিতজ্ঞরা কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাস পূর্বানুমান করতে পেরেছিলেন পরে যা ইউরোপে বিকাশ লাভ করে, বিশেষত বৃত্তের পরিধি নির্ণয়ে অপরিমেয় ক্ষুদ্রর বিবেচনা কলনবিদ্যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধারণার সমতুল্য। কিছু লেখক মনে করেন এটি ততদিনে কলনবিদ্যারই রূপ পেয়েছে।

এই সমৃদ্ধ গণিত ঐতিহ্যের যথাযত মান্যতার জন্য এখনও অনেক কিছু করার আছে। অদ্যপি বর্তমান পাণ্ডুলিপিগুলির ক্ষয় থেকে রক্ষার জন্য সঠিক যত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমস্ত সাম্প্রতিকতম তথ্য সংযোজন করা এবং সর্বোপরি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযত চর্চার দ্বারা গাণিতিক উপলব্ধিগুলি বিশ্ব গণিত মানচিত্রে উপযুক্ত স্থান দেওয়া প্রয়োজন। আশা করা যায় এই প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে এই মহান কাজে ব্রতী করে তুলবে। অন্যথায় মিথ্যা অপপ্রচারে এসব কিছু বিনষ্ট হবে।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

ডঃ এস. জি. দানি ‘স্কুল অফ মাথেমেটিক্স’, টিআইএফআর, মুম্বই-এর প্রফেসর এবং আইআইটি, বম্বে-র গণিত বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর পদে গবেষণারত। মুম্বই ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৬৯ সালে এমএসসি করে উনি টিআইএফআর, মুম্বাই থেকে ১৯৭৫ সালে পিএইচডি করেন। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯০ সালে তাঁকে ‘ভাটনগর’ পুরস্কারে সন্মানিত করা হয়। ২০০৭ সালে তিনি ‘ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স’ পুরস্কারও লাভ করেন।

প্রফেসর দানির লেখাটি ইংরিজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে ‘বিজ্ঞান’-এর অমলেশ রায়, ঝুমা সন্নিগ্রাহী, ও রাজীবুল ইসলাম।

লেখাটি ‘বিজ্ঞান’ (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ৩১শে অক্টোবর ২০১৬

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো

https://bigyan.org.in/2016/10/31/vedic_mathematics/

প্রচ্ছদের ছবি : বক্ষালী পাণ্ডুলিপি

অতিরিক্তঃ

১। অনুবাদকের সংযোজন – ‘বৃত্তীয় চতুর্ভুজ’ (cyclic quadrilateral) হল এমন একটি চতর্ভুজ যার চারটি শীর্ষবিন্দু একটি বৃত্তের পরিধির উপর অবস্থিত।

রামানুজন সংখ্যা ১৭২৯

স্বর্নেন্দু শীল

হার্ডি আর রামানুজনের কথোপকথনের গল্প ও ট্যাক্সির নাম্বার ১৭২৯ এর গল্পও বহুল প্রচলিত। বস্তুত এই কথোপকথনের সম্মানে অঙ্কে " ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যাকে n রকম ভাবে দুখানা ধণাত্মক ঘনসংখ্যার যোগফল হিসেবে লেখা যায়" -- তাদেরকে Taxicab numbers বলা হয়।

$$Ta(1) = 2 = 1^3 + 1^3, Ta(2) = 1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3, Ta(3) = 87539319 = 167^3 + 436^3 = 228^3 + 423^3 = 255^3 + 414^3$$

সমান ঘাতের যোগফল খুঁজতে রামানুজন খুবই ভালবাসতেন। তাঁর এরকম আর একটা ফর্মুলা - যদি $a + b + c = 0$ হয়, তাহলে

$$2(ab + bc + ca)^4 = a^4(b - c)^4 + b^4(c - a)^4 + c^4(a - b)^4.$$

এইটা অবশ্যই খুব একটা কঠিন নয়, রামানুজনের পক্ষে তো নয়ই। কিন্তু রামানুজন $2(ab + bc + ca)^{2n}$ নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন ও ফর্মুলাও দিয়ে গেছেন। এইরকমই একটা রীতিমত কঠিন ফর্মুলা

$64F_6(a, b, c, d)F_{10}(a, b, c, d) = 45[F_8(a, b, c, d)]^2$ যেখানে।

$$F_{2m}(a, b, c, d) = (a + b + c)^{2m} + (b + c + d)^{2m} - (c + d + a)^{2m} - (d + a + b)^{2m} + (a - d)^{2m} - (b - c)^{2m}.$$

খানিকটা একই রকম চরিত্রের রামানুজনের আরো একটি অসাধারণ ফর্মুলা

$$[\cos(\frac{2\pi}{9})]^{\frac{1}{3}} + [\cos(\frac{2\pi}{9})]^{\frac{1}{3}} - [\cos(\frac{2\pi}{9})]^{\frac{1}{3}} = [\frac{3}{2}(9^{\frac{1}{3}} - 2)]^{\frac{1}{3}}.$$

মৌলিক সংখ্যার মৌলিকতা

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

স্কুলজীবনে গণিতবিদ্যায় হাতে খড়ির একেবারে সাথেসাথেই মাস্টারমশাই এর বেত্রাঘাতের দাপটেই হোক বা স্বাভাবিক কৌতূহলবশেই হোক, পড়ুয়াদের মজ্জাগত হয়ে যায় সংখ্যা (numbers) দুই ধরনের: মৌলিক (prime) ও যৌগিক (composite)। কোনো সংখ্যাকে যদি কেবলমাত্র এক এবং সেই সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যায় (অর্থাৎ ভাগশেষ শূন্য আসে), তাকে বলা হয় মৌলিক সংখ্যা। এই মৌলিক সংখ্যার গণিতচর্চাই পরবর্তীকালে কম্পিউটার সায়েন্সের আনুকূল্যে ক্রিপ্টোগ্রাফি (cryptography / সংকেতলিপি)-র মতো বিষয়ে একটি মূল অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাই এই মৌলিক সংখ্যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা কিছু বিস্ময় তোমাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই।

স্কুলে থাকাকালীনই ছাত্র-ছাত্রীরা এই মৌলিক সংখ্যার কিছু আশ্চর্য গুণাগুণ নিজেরাই দেখতে পেয়ে যায়। প্রথমতঃ দুই ছাড়া আর কোনো জোড় সংখ্যা মৌলিক (even prime) হয় না, কারণ অন্য যে কোনো জোড় সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য। দ্বিতীয়তঃ সমস্ত মৌলিক সংখ্যার ব্যাপ্তি বেশ অবিন্যস্ত। অর্থাৎ তারা বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুরুর দিকের মৌলিক সংখ্যাগুলির ওপর চোখ বোলালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে : ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ... । সুতরাং, যদি প্রশ্ন করা হয় : ২০১৭-তম মৌলিক সংখ্যাটি কি? মৌলিক সংখ্যার গণনার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট ফর্মুলা না থাকায় কম্পিউটার বাবাজীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই।

কতগুলো মৌলিক সংখ্যা হয়?

স্বাভাবিক ভাবেই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়: মৌলিক সংখ্যাদের দেখে তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা বেশ বিরল। তোমরা নিজেরাই চেষ্টা করে দেখো ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলি লিখে ফেলতে। কী? জটিল লাগছে তো? তাহলে এরকম একটা অতীব বিরল ব্যাপারের কি আদৌ কোনো শেষ আছে ? অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে : মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা সসীম না অসীম ?

এই প্রশ্নটির খুব সরল অথচ গাণিতিকভাবে আকর্ষণীয় প্রমাণ দেন গ্রীক গণিতজ্ঞ ইউক্লিড। তিনি প্রমাণ করেন মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা অসীম।

প্রমাণটা এইরকম: আমরা শুরুতে ধরে নিই যে মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা সসীম। সেই সীমাটাকে চিহ্নিত করা যাক। ধরা যাক, n-খানা মৌলিক সংখ্যা হতে পারে। মৌলিক সংখ্যাগুলির নামকরণ করলাম p1 , p2 , ... , pn হিসেবে। এই n-খানা সংখ্যার বাইরে আর কোনো মৌলিক সংখ্যা নেই।

কিন্তু, একটা মৌলিক সংখ্যা সহজেই বানানো যায় যেটা এর বাইরে। p1 , p2 , ... , pn সংখ্যাগুলোকে গুন করে তার সাথে এক যোগ করে একটা নতুন সংখ্যা তৈরী করা যাক:

$$(p_১ X p_২ X ... X p_n) + ১$$

এই সংখ্যাটি $p_১$, $p_২$, ... , p_n -এর মধ্যে কোনো একটা নয় কারণ সে এদের গুণফলের থেকেও বড়। আবার একে $p_১$, $p_২$, ... , p_n -এর মধ্যে যেকোনো একজনকে দিয়ে ভাগ করলেই ভাগশেষ (রিমেন্ডার) এক হবে। অতএব কোনো মৌলিক সংখ্যার দ্বারাই সে বিভাজ্য নয়। তাই সে নিজেই মৌলিক।

সুতরাং, আমাদের শুরুর অনুমানটা অসম্ভব এবং মৌলিক সংখ্যার সংখ্যা অসীম। এটা এক সেট মৌলিক সংখ্যা নিয়ে সহজেই দেখতে পারো। যদি ২ আর ৩-এ মিলে মৌলিক সংখ্যা শেষ হতো, তাহলে সেটা ডাহা ভুল হতো কারণ

$$(২ X ৩) + ১ = ৭$$

এটাও একটা মৌলিক সংখ্যা। যদি {২, ৩, ৫, ৭} মিলে মৌলিক সংখ্যা শেষ হতো, সেটাও ভুল হতো কারণ

$$(২ X ৩ X ৫ X ৭) + ১ = ২১১$$

এটাও মৌলিক সংখ্যা। যেখানেই শেষ ধরে নিই না কেন, আরো বড় একটা মৌলিক সংখ্যা তৈরী করতে পারি।

এই ধরণের প্রমাণের পদ্ধতিকে বলে "মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন"। পদ্ধতিটি কিছুটা এরকম: যে জিনিসটা প্রমাণ করতে চলেছি, তার বিপরীত বক্তব্যকে ধরে নেব সত্য বলে। তা থেকে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবো যেটা শুরুর ধরে নেওয়া বক্তব্যটাকে নাকচ করে দেয়।

সংখ্যায় অসীম হলে যোগফলও কি অসীম হবে?

গণিতের জগতে যখনই এরকম কোনো বিশেষ ধরণের সংখ্যাগোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা অসীম হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে তাদের অসীম সমষ্টি বা তাদের কোনো বিশেষ রূপের অসীম সমষ্টির মান নিয়ে।

ছোট্ট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরা যাক : ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ , ... এই ধরণের সংখ্যার কথা। অর্থাৎ ২n জাতীয় সংখ্যা যেখানে n হলো ১, ২, ৩, ৪, ..। যেহেতু এগুলি ধনাত্মক (পজিটিভ), এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, তাই এর অসীম সমষ্টিকে নিলে আমরা কোনো সসীম মান পাবো না। কিন্তু আমরা যদি এর অনোন্যক সংখ্যাগুলির (রেসিপ্রোকাল-এর) সমষ্টির কথা ভাবি:

$$১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ১/৩২ + ...$$

তাহলে দেখবো এই অসীম সমষ্টির মান কিন্তু সসীম:

১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ১/৩২ + ... = ২

প্রমাণ করা সোজা। যদি যোগফলটা S হয়, তাহলে:

S = ১ + + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ১/৩২ + ...

= ১ + ১/২ [১ + ১/২ + ১/৪ + ১/৮ + ১/১৬ + ...] = ১ + ১/২ S

সমীকরণটা সমাধান করলে দাঁড়ায় S = ২।

ওই একই প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে মৌলিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও। এদের অসীম সমষ্টি বা অনোন্যকের অসীম সমষ্টির মান সসীম না অসীম? প্রথম অসীম সমষ্টির ক্ষেত্রে উত্তরটা সোজা:

২ + ৩ + ৫+ ৭+ ১১ + ১৩ + ১৭ + ১৯ +২৩ + ...

প্রত্যাশিত ভাবেই সমষ্টির মান অসীম কারণ অসীম সমষ্টিটি ধনাত্মক, ক্রমবর্ধমান সংখ্যার যোগফল।

কিছুটা আশ্চর্য ফল পাওয়া যায় অনোন্যকের অসীম সমষ্টিটির ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি ধনাত্মক এবং ক্রমহ্রাসমান। অর্থাৎ, সিরিজ-এ যত এগোচ্ছি, সংখ্যার মান কমতে থাকছে। তা সত্ত্বেও এই যোগফলটা কিন্তু অসীম:

১/২ + ১/৩ + ১/৫+ ১/৭+ ১/১১ + ১/১৩ + ১/১৭ + ১/১৯ +১/২৩ + ...

আমাদের আগের উদাহরণের সাথে তুলনা করলে একটু চমকে ওঠা স্বাভাবিক।

মৌলিক সংখ্যাগুলির অনোন্যকদের যোগফল অসীম – এই গাণিতিক সত্যটি প্রথম প্রমাণ করেন সুইস গণিতজ্ঞ লিওনার্ড অয়লার (Leonhard Euler)। যদিও পাঠকবন্ধুদের সুবিধার্থে আমরা হাঙ্গেরিয়ান গণিতজ্ঞ পল এরদিশ (Paul Erdős)-এর আবিষ্কৃত প্রমাণে চোখ রাখবো। এই প্রমাণটিও "মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন"-এর ওপর নির্ভরশীল।

মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন

এর আগে মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন-টা এরকম ভাবে দেখেছিলাম: যা প্রমাণ করতে চাই, তার বিপরীতটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। সেখান থেকে ধরে নেওয়া সত্যটার একদম বিপরীত সত্যে উপনীত হয়েছিলাম। এবার যেভাবে প্রমাণ করবো, সেটাও মেথড অফ কন্ট্রাডিকশন। তবে আপাতভাবে একটু অন্যরকম।

এখানেও যা প্রমাণ করতে চাই, তার বিপরীত সত্যটা ধরে নেব। ধরে নেওয়ার ফলে দুটো সিদ্ধান্ত পাবো, যারা একে অপরের সরাসরি বিরোধী। যেহেতু শুরুতে ধরে নেওয়াটা ছাড়া আর কোথাও প্রমাণে ফাঁক নেই, অতএব এই পরস্পর-বিরোধী দুটো সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে যে ধরে নেওয়াটা ভুল ছিল।

যা প্রমাণ করতে চাই, তার বিপরীত-টা কল্পনা করা যাক। অর্থাৎ, এই অসীম সমষ্টির মান সসীম। এই মানটিকে "S" হিসেবে চিহ্নিত করা যাক:

১/২ + ১/৩ + ১/৫+ ১/৭+ ১/১১ + ১/১৩ + ১/১৭ + ১/১৯ +১/২৩ + ... = S

এবার মৌলিক সংখ্যাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যাক:
প্রথম ভাগ: ২, ৩, ৫, ৭, ..., p_n । এদের 'ছোট' মৌলিক সংখ্যা বলি।
দ্বিতীয় ভাগ: $p_{n+১}$, $p_{n+২}$, $p_{n+৩}$,...। এদের 'বড়' মৌলিক সংখ্যা বলি।

ভাগটা কোথায় করছি, সেটা এই প্রমাণের জন্য জরুরি নয়। কিন্তু বোঝার সুবিধের জন্য ভাগটা এমনভাবে করলাম যাতে প্রথম ভাগের সমষ্টি (S – ১/২)-এর থেকে একটু বেশি আর দ্বিতীয় ভাগের সমষ্টি ১/২-এর থেকে ঠিক ততটাই কম (দু-ভাগের যোগফল যাতে S থাকে)। অসমীকরণগলো লিখলে দাঁড়ায় এরকম:

১/২ + ১/৩ + ১/৫ + ১/৭ +... + ১/pn > S – ১/২
১/pn+১ + ১/pn+২ + ১/pn+৩ +... < ১/২

খেয়াল রেখো, ১/২ ব্যাপারটা এখানে জরুরি নয়। এক ভাগের সমষ্টির মান S-এর থেকে সামান্য কম, ব্যস এইটুকুই প্রয়োজন। তবে, ১/২ ধরলে অঙ্কটা করতে সুবিধে হয়।

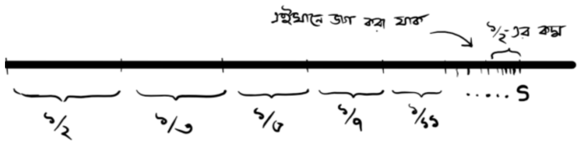

এবার একদল স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়ে (অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ... ,N), তাদের দুদলে ভাগ করা যাক:

প্রথম দল: এরা একমাত্র ছোট মৌলিক সংখ্যাগুলোর দ্বারাই বিভাজ্য। অর্থাৎ এদের গুণকনির্ণয় (ফ্যাক্টরাইজেশান) করলে কোনো বড় মৌলিক সংখ্যা আসেনা।

দ্বিতীয় দল: এদের গুণকনির্ণয় করলে এক বা একাধিক বড়ো মৌলিক সংখ্যা আসে।

প্রথম দলে যত সংখ্যা আছে, সেটাকে N_s হিসেবে চিহ্নিত করলাম আর দ্বিতীয় দলে যত সংখ্যা আছে, সেটাকে N_b। 's' ছোট বা স্মল-এর প্রতীক আর 'b' বড়ো বা বিগ-এর।

একই উৎস থেকে পরস্পর-বিরোধী সত্য

যে পরস্পর-বিরোধী দুটো সত্য এবার বেরিয়ে আসবে, সেগুলোকে অঙ্কের ভাষায় লেখা খুব সোজা। প্রথমটা হলো:

$N_s + N_b = N$

দ্বিতীয়টা হলো:

$N_s + N_b < N$

অর্থাৎ, দুদলের সংখ্যার সমষ্টি যতগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা নিয়েছিলাম, তার সমান এবং কম। দুটোই একসাথে সত্যি হতে পারেনা। তাই একদম শুরুতে যেটা ধরে নিয়েছিলাম, অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যার অনোন্যকের সমষ্টি সসীম, সেটা নিশ্চয়ই ভুল।

একে একে দুটো সত্যিকে এবার সাব্যস্ত করা যাক। প্রথমটা সোজা। দুটো দল এমনভাবে গঠন করেছিলাম যে ১, ২, ৩, ৪, ..., N-এর মধ্যে যে কোনো একটা স্বাভাবিক সংখ্যা নিলে, সে হয় প্রথম দলে থাকবে, নতুবা দ্বিতীয় দলে। অতএব দুই দলের সদস্যসংখ্যার সমষ্টি N হতে বাধ্য:

$N_s + N_b = N$

দ্বিতীয় সত্যটাকে প্রমাণ করতে একটু কাঠখড় পোড়াতে হবে। এক এক করে ছোট-র দল আর বড়ো-র দলকে দেখা যাক। বড়ো-র দল দিয়ে শুরু করি।

বড়ো-র দল: যাদের অন্তত একটা ফ্যাক্টর বড়ো মৌলিক সংখ্যা

বড় মৌলিক সংখ্যাগুলোকে তৈরী করা হয়েছিল এই অসমীকরণটার সাহায্যে:

$১/p_{n+১} + ১/p_{n+২} + ১/p_{n+৩} +\dots < ১/২$

অসমীকরণটার দুদিকেই N দিয়ে গুন করলে আসে:

$N/p_{n+১} + N/p_{n+২} + N/p_{n+৩} +\dots < N/২$

এবার বড়ো মৌলিক সংখ্যা ছেড়ে বড়ো স্বাভাবিক সংখ্যা-র দলটাকে দেখা যাক। এই দলে তারাই আছে যাদের অন্তত একটা গুণনীয়ক (ফ্যাক্টর) একটা বড়ো মৌলিক সংখ্যা। এবার আমরা গুনবো, এই বড়ো-র দলে কতগুলো সদস্য আছে।

N-এর থেকে ছোট এবং যার একটা গুণনীয়ক $p_{n+১}$, সেই সংখ্যাগুলোকে লেখা যাক:

$p_{n+১}, ২p_{n+১}, ৩p_{n+১}, ৪p_{n+১},\dots$

এরকম করে গুনতে থাকলে N-এ গিয়ে থামবো (যদি N হয় $p_{n+১}$ -এর একটা গুণিতক বা মাল্টিপল), বা তার একটু আগে থামবো। অর্থাৎ এরকম সংখ্যা পাবো $N/p_{n+১}$ গুলো বা তার কম [টীকা ১] । একই কথা $p_{n+২}$, $p_{n+৩},\dots$, ইত্যাদি-র ক্ষেত্রেও বলা চলে।

তাহলে, বড়ো-র দলে যতগুলো সদস্য আছে, সেটা $N/p_{n+১} + N/p_{n+২} + N/p_{n+৩} +\dots$-এর সমান হতে পারে বা তার কম। এই সদস্যসংখ্যাকেই নাম দিয়েছিলাম N_b। অতএব:

$N_b \leqq N/p_{n+১} + N/p_{n+২} + N/p_{n+৩} +\dots < N/২$

দ্বিতীয় অসমীকরণটা এই সেকশন-এ একটু আগেই দেখলাম।

সুতরাং, বড়োর দলের সংখ্যা অর্থাৎ N_b সংখ্যাটি N/২-এর থেকে কম। এবার ছোট-র দলে যাওয়া যাক। এটুকু প্রমাণ করলেই হবে যে সেই দলের সদস্যসংখ্যা অর্থাৎ N_s সংখ্যাটি N/২ এর সমান বা কম। তাহলেই, এইটা প্রমাণ হয়ে যাবে:

$N_s + N_b < N$

ছোট-র দল: যাদের সব ফ্যাক্টর-ই ছোট মৌলিক সংখ্যা

ছোট-র দলে সেইসব সংখ্যা ছিল যাদের সবকটা গুণনীয়কই (ফ্যাক্টর) ছোট মৌলিক সংখ্যা। অর্থাৎ এদেরকে ভাঙলে যে কোনো ছোট মৌলিক সংখ্যা শূন্য, এক বা একাধিকবার আসবে। অর্থাৎ, ছোট-র

দলে যে কোনো একটা সংখ্যা m-কে লেখা যায় এইভাবে:

$m = a_m X b_m^২$

am-এর মধ্যে যে কোনো ছোট মৌলিক সংখ্যা শূন্যবার বা একবার এসেছে। $b_m^২$ -এর মধ্যে ছোট মৌলিক সংখ্যা জোড়সংখ্যক-বার এসেছে। ধরো, ৫৪ সংখ্যাটি। এটাকে লেখা যায়:

৫৪ = ২ X ৩ X ৩ X ৩

এক্ষেত্রে am হলো ২ X ৩ আর $b_m^২$ হলো ৩ X ৩। এরকমভাবে ভাগ করতে হলে আগে সংখ্যাটির পুরো গুনকনির্ণয় করো। তারপর যেসব মৌলিক সংখ্যাগুলো বিজোড়সংখ্যকবার এসেছে, তাদের থেকে একটা করে নিয়ে a_m-এ ঢোকাও। বাকি যা পড়ে রইলো, সেগুলো $b_m^২$ -এ ঢোকাও।

এবার a_m আর b_m–কে আলাদা করে দেখি।

a_m : এক একেকটা a_m হলো আসলে ছোট মৌলিক সংখ্যার বিন্যাস (ডিস্ট্রিবিউশন বা অ্যারেঞ্জমেন্ট) যার মধ্যে যে কোনো ছোট মৌলিক সংখ্যা হয় শূন্যবার নয় একবার এসেছে। এরকম কতগুলো বিন্যাস হয়? ২n-গুলো, যেখানে n-খানা ছোট মৌলিক সংখ্যা রয়েছে।

b_m: শুরুতে ১,২,৩,৪...,N-এর মধ্যে থেকেই ছোট-বড়ো সব দল তৈরী করেছিলাম। তাই ছোট-র দলের যে কোনো সংখ্যা (যাকে m বলছি) N-এর থেকে ছোট বা সমান। তাই, $b_m^২$-ও N-এর থেকে ছোট বা সমান। তাই:

$b_m \leqslant \sqrt{N}$

এবার উপরের দুটো তথ্যকে মেলানো যাক। যেহেতু যেকোনো ছোট-র দলের সদস্যকে a_m X $b_m^২$ হিসেবে লেখা যায়, তাই ছোট-র দলের সদস্যসংখ্যা N_s এই অসমীকরণটি মেনে চলে:

$N_s \leqslant ২^n \sqrt{N}$

এতক্ষন N-এর উপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। যা খুশি হতে পারতো। এবার N যদি $২^{২n+২}$ হয়, তাহলে এরকম দাঁড়াবে:

$N_s \leqslant ২^n \sqrt{N} = ২^{২n+১} = N/২$

আর N যদি $২^{২n+২}$-এর থেকে বেশি হয়, তাহলে এরকম দাঁড়াবে:

$N_s \leqslant ২^n \sqrt{N} < N/২$

অর্থাৎ, অন্তত কিছু N-এর ক্ষেত্রে ছোট-র দলের সংখ্যা N/২-এর সমান বা কম। আগের সেকশন-এ দেখেছিলাম, বড়ো-র দলের সংখ্যা N/২-এর কম। দুইয়ে মিলে দাঁড়ালো:

$N_s + N_b < N$

যেটা $N_s + N_b = N$-এর সরাসরি বিরোধ করে। অতএব একদম শুরুতে যে ধরে নিয়েছিলাম:

১/২ + ১/৩ + ১/৫+ ১/৭+ ১/১১ + ১/১৩ + ১/১৭ + ১/১৯ +১/২৩ + ... = S

যারা বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে জানতে ইচ্ছুক তাদেরকে কয়েকটি বইয়ের কথা অবশ্যই বলতে হয় :

Introduction to the Theory of Numbers by G. Hardy & E. Wright (Oxford)

Ingenuity in Mathematics by Ross Honsberger (Mathematical Association of America)

Proofs from THE BOOK by Martin Aigner (Springer)

টীকা ১: আসলে সংখ্যাটা হলো ফ্লোর ফাঙ্কশন $N/p_{n+১}$। ফ্লোর ফাঙ্কশন সম্পর্কে আরো জানতে এখানে দেখো:

https://en.wikipedia.org/wiki/Floor_and_ceiling_functions

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

নীলাব্জ চ্যাটার্জী বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ অসলো-তে গণিত বিভাগে পি.এইচ.ডি ছাত্র এবং ‘বিজ্ঞান’-এর স্বেচ্ছাসেবক।

লেখাটি ‘বিজ্ঞান’ (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ জুলাই, ২০১৭

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো

https://bigyan.org.in/2017/07/17/prime-numbers/

প্রচ্ছদের ছবি : ইউক্লিড (ছবির উৎস-উইকিপেডিয়া)

হার্ডি রামানুজনের যুগলবন্দী

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

রামানুজন আর হার্ডি-র যুগ্ম গবেষণার সবথেকে সফল কাজ ছিল পার্টিশন ফাঙ্কশন নিয়ে। একটা পূর্ণসংখ্যা n-কে n বা তার থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা যোগ করে কতভাবে তৈরী করা যায়, সেইটাই হ'ল তার পার্টিশন ফাঙ্কশন, P(n)। যেমন, 5 কে তৈরী করা যায় এইভাবে: 1+1+1+1+1, 1+1+1+2, 1+1+3, 2+2+1, 1+4, 2+3, 5। যেহেতু সাতভাবে ভাঙ্গা যায়, P(5) = 7। রামানুজন আর হার্ডি চেষ্টা করেছিলেন পার্টিশন ফাঙ্কশন-এর একটা ফর্মুলা তৈরী করতে। যাতে খুব বড় সংখ্যার জন্য কতভাবে ভাঙ্গা যায়, সেটা সংখ্যাটাকে না ভেঙ্গেই ফর্মুলার সাহায্যে বলে দেওয়া যাবে।

যদিও সেই ফর্মুলাতে তারা পৌঁছতে পারেননি, কিন্তু খুব কাছাকাছি গেছিলেন। অঙ্কের ভাষায় 'খুব কাছাকাছি'-কে একটা সুস্পষ্ট অর্থ প্রদান করা যায়। তারা যে ফর্মুলাটা বার করেছিলেন, সেটা যাকে বলে অ্যাসিম্পটোটিক (asymptotic) ফর্মুলা। অর্থাৎ সংখ্যাটা যত বড়ো হবে, ফর্মুলাটা ততটাই ঠিক হবে। ফর্মুলাটা এইরকম:

$$P(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}}$$

ওনারা দেখিয়েছিলেন যে ওনাদের ফর্মুলা থেকে পার্টিশন ফাঙ্কশন-এর আসল মান-এর পার্থক্যটা কখনোই একটা গণ্ডির বাইরে যায় না। অঙ্কের ভাষায়, ফর্মুলায় গলদ বা এরর (error)-টা সীমাবদ্ধ বা বাউন্ডেড (bounded)। এই ফর্মুলাটা বার করতে তারা একটা সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির আমদানি করেছিলেন যেটা পরবর্তীকালে সার্কেল মেথড নামে পরিচিত হয়।

তবে মজার কথা হ'ল, ওনাদের স্থির বিশ্বাস ছিল পার্টিশন ফাঙ্কশন-এর ফর্মুলা বার করতে এর থেকেও ভালো কিছু করা যায়। কারণ ওনাদের কাজটা যাচাই করতে ওনারা আরেক গণিতজ্ঞকে কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই গণিতজ্ঞ ২০০ অব্দি সবকটা সংখ্যার জন্য P(n)-এর মান হাতে গুনে বার করলেন। দেখা গেলো ওনাদের ফর্মুলাটা, যেটাকে ওনারা অ্যাপ্রক্সিমেট বা মোটামুটি ঠিক বলে ধরেছিলেন, সেটা আসল মান-এর খুউব কাছাকাছি সংখ্যা দিচ্ছে। তাই ওনাদের বদ্ধমূল ধারণা হ'ল যে নিশ্চয় একটা ফর্মুলা রয়েছে যেটা একদম ঠিক হবে। এবং সত্যিই বিশ বছর পর ১৯৩৭ সালে হান্স রাদেমাকার সঠিক ফর্মুলাটা দিতে সক্ষম হন। সেই ফর্মুলাটা একটা সিরিজ, যার প্রথম টার্ম-টা ছিল হার্ডি-রামানুজন-এর দেওয়া সেই মোটামুটি ঠিক ফর্মুলা!

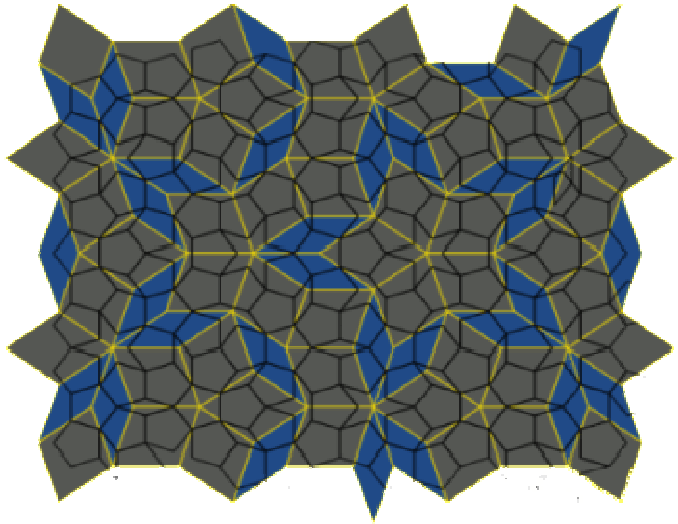

জ্যামিতির গোড়ার কথা : ইউক্লিড থেকে রীমান

স্বর্ণেন্দু শীল

|| ২য় পর্ব ||

এইবারে আমরা ঢুকব ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের আলোচনায়। একবার দেখে নিই কি বলছে এই স্বতঃসিদ্ধ।

একটি সরলরেখা অন্য দুটি সরলরেখাকে ছেদ করলে, যদি কোন একটি দিকে অন্তর্বর্তী কোণদ্বয়ের যোগফল দুই সমকোণের কম হয়, তবে সরলরেখা দুটিকে অনির্দিষ্টভাবে বর্ধিত করলে সেই দিকে মিলিত হবে।

ইউক্লিড ভেবেছিলেন যে এটা একটা উপপাদ্য। অর্থাৎ, এটাকে অন্য স্বতঃসিদ্ধগুলো থেকে প্রমাণ করা সম্ভব। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কেউ এটা প্রমাণ করতে পারেনি। এই প্রমাণ করার চেষ্টার মধ্যে দিয়েই একদিন বোঝা গেল যে এটাও জ্যামিতিতে পূর্ব প্রদত্ত। অন্য স্বতঃসিদ্ধগুলো থেকে আসে না। কিভাবে বোঝা গেল, সেটা বুঝতে আমাদের কয়েকটা সংজ্ঞা জানতে হবে।

১. **সরলরেখা** বা লাইন — আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি: যে সংজ্ঞা আমরা এখানে দেখব, তা গাণিতিকভাবে নিখুঁত কোন সংজ্ঞা নয়। বস্তুত কোন সংজ্ঞাই নয়। জ্যামিতিতে বিন্দুর মতই সরলরেখাও একটা অসংজ্ঞায়িত ধারণা। তবু সেই ধারণাটাকে বুঝতে আমরা কিছু একটাকে, যাকে এই ধারণাটার ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে, সংজ্ঞা বলে চালাব।

যেকোনো দুইটি বিন্দুর মধ্যে হ্রস্বতম দূরত্বের পথটিকে ওই দুইটি বিন্দু দিয়ে যাওয়া সরলরেখাংশ বলা হয়। যেকোনো সরলরেখাংশকে দুইদিকে অসীমভাবে বর্ধিত করলে একটি সরলরেখা পাওয়া যায়।

২. সমান্তরাল সরলরেখা বা প্যারালাল লাইন — এটা ইউক্লিডেও যা, আজও সেই সংজ্ঞাটাই ব্যবহার করি আমরা। এই সংজ্ঞাটা দেখায় কতটা দূরদর্শী ছিল ইউক্লিডের প্রতিভা।

একই তলে অবস্থিত দুটি সরলরেখাকে উভয়দিকে অসীমভাবে বর্ধিত করলে, যদি কোন দিকেই তারা পরস্পরকে ছেদ না করে, তাহলে এই সরলরেখাদ্বয়কে পরস্পরের সমান্তরাল বলা হয়।

এবার ফিরে যাই ইতিহাসে। পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধর ইতিহাস। আগেই বলেছি বহু শতাব্দীর বহু গণিতজ্ঞ চেষ্টা করার পরেও কেউই এটা প্রমাণ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ নিকোলাই লোবাচেভস্কি নামে এক রাশিয়ান গণিতজ্ঞ ও জানোস বোলেয়াই নামে এক হাঙ্গারিয়ান গণিতজ্ঞ দুজনে প্রায় একই সময়ে এই সমস্যাটার নিষ্পত্তি করলেন।[1]

কি নিষ্পত্তি? সেটা বুঝতে আমাদের দেখতে হবে তাঁরা ঠিক কিভাবে ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। মজার কথা হলো, পদ্ধতিটা ইউক্লিডেরই উদ্ভাবন বলে মনে করা হয় - স্ববিরোধের সাহায্যে প্রমাণ (proof by contradiction)। ব্যাপারটা এরকম:

আমি যা প্রমাণ করতে চাইছি, তার উলটোটা সত্যি বলে ধরে নিয়ে শুরু করব।
তারপর তার থেকে আর কি কি প্রমাণ হয়, সেটা দেখব।

যদি এমন কিছু প্রমাণ করে ফেলি যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তাহলে আমাদের প্রথম ধরে নেওয়াটা সত্যি হতে পারে না। যেহেতু যা প্রমাণ করতে চাইছি তার উলটোটা ধরে নিয়েছিলাম, যা প্রমাণ করতে চাইছি, সেটা সত্যি হতেই হবে।

যেমন ধরা যাক, কিছু একটা বক্তব্য x-কে প্রমাণ করতে চাই। তার উলটোটা, যাকে অঙ্কের ভাষায় বলে, x কমপ্লিমেন্ট, সেটাকে সত্যি বলে ধরে নিলাম। তার থেকে ধরুন প্রমাণ করে ফেললাম, ২ < ২। যেহেতু ২ < ২ অসম্ভব, তাই প্রমাণ হয়ে গেল যে x সত্যি।

এবার পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধের একটা তুল্যমূল্য প্রতিপাদ্য আছে। এর নাম প্লেফেয়ারের স্বতঃসিদ্ধ।

একটি সরলরেখা এবং ওই সরলরেখায় আপতিত নয় এমন একটি বিন্দু দেওয়া থাকলে, ওই বিন্দু দিয়ে ওই সরলরেখার সমান্তরাল করে একটি এবং একটিমাত্র সরলরেখা টানা যায়।

এইটা আর পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ যে তুল্যমূল্য, তা বোলেয়াই ও লোবাচেভস্কির অনেক আগে থেকেই জানা ছিল। কেন তুল্যমূল্য, তা আপনারাও একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন। পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ বলছে, একটি সরলরেখা অন্য দুটি সরলরেখাকে ছেদ করলে, যেদিকে অন্তর্বর্তী কোণদ্বয়ের যোগফল দুই সমকোণের কম, সেদিকে মিলিত হতে বাধ্য। তার মানে, সরলরেখা দুটি সমান্তরাল হলে, ছেদকের দুদিকেই অন্তর্বর্তী কোণদ্বয়ের যোগফলকে ঠিক দুই সমকোণ হতে হবে। আর তাই, একটি সরলরেখা ও একটি বিন্দু দেওয়া থাকলে:

- বিন্দুটা থেকে সরলরেখাটির ওপর লম্ব টানব প্রথমে।
- তারপর সেই লম্বটির উপর আর একটি লম্ব টানব বিন্দুটা দিয়ে।

এই দ্বিতীয় লম্বটিই ওই বিন্দু দিয়ে যাওয়া সমান্তরাল সরলরেখাটি, যা আমরা খুঁজছি। নিচের ছবি দেখলেই বুঝবেন ইউক্লিডীয় দ্বিসমতলীয় জ্যামিতিতে কেন এইটা হবে।

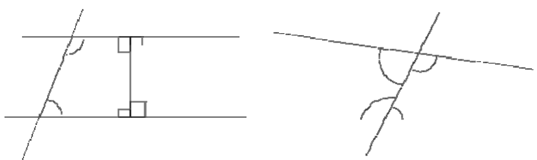

লোবাচেভস্কি ও বোলেয়াই এই তুল্যমূল্য প্রতিপাদ্যটারই উলটো ধরে নিয়ে শুরু করেছিলেন। এই প্রতিপাদ্যটার উলটো কি? যেহেতু প্রতিপাদ্যটা বলছে এক এবং একটিমাত্র সমান্তরাল সরলরেখা টানা যায় তাই তার উলটো হওয়া উচিৎ এরকম:

একটি সরলরেখা এবং ওই সরলরেখায় অপতিত নয় এমন একটি বিন্দু দেওয়া থাকলে, ওই বিন্দু দিয়ে ওই সরলরেখার সমান্তরাল করে হয় একটিও সরলরেখা টানা যায় না, অথবা একাধিক সরলরেখা টানা যায়।

তা, ওঁরা দুজনেই শুরু করেছিলেন একাধিক টানা যায়, এইটা ধরে নিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল ইউক্লিডের বাকি চারটে স্বতঃসিদ্ধ আর এই একাধিক সমান্তরাল সরলরেখা টানা যাবে, এইটা ধরে শুরু করে একের পর এক উপপাদ্য প্রমাণ করে যাবেন, যতক্ষণ না কোন যৌক্তিক স্ববিরোধ (logical contradiction) খুঁজে পান। দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেছিলেন দুজনেই। কেউ কারও কাজের কথা জানতেনও না। মোটামুটি একই সময়ে দুজনেই থেমে যান। এবং না, দুজনের কেউই পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করতে পারেন নি।

তবে থেমে গেলেন কেন? কারণ দুজনেই এক আশ্চর্য কাজ করে ফেলেছিলেন। যৌক্তিক স্ববিরোধ খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা দুজনেই একেবারে নতুন জ্যামিতি তৈরি করে ফেলেছিলেন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতই তা, আর তাতে কোন স্ববিরোধও নেই। শুধু আছে একটা কিন্তু। কিন্তু কি? তাদের তৈরি করা জ্যামিতিতে উপপাদ্যগুলো যা বলছে, সেগুলো ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সাথে মেলে না বেশিরভাগই।

কিরকম? ধরুন, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির একটা উপপাদ্য:

ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সর্বদা দুই সমকোণের সমান।

লোবাচেভস্কি ও বোলেয়াইয়ের জ্যামিতিতে এই উপপাদ্যটা আর সত্যি নয়। তবে এরকমই একটা উপপাদ্য আছে:

ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সর্বদা দুই সমকোণের কম।

এখানে মনে হতে পারে, এই তো এই একটা অসম্ভব জিনিস! এই তো পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হল! না, তা হল না, কারণ এটা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব কিছু না। আমরা খাতার পাতায় ত্রিভুজ এঁকে কোণ মেপে দেখলে দুই সমকোণ বেরোয় ঠিক, তাই এই উপপাদ্যটা অদ্ভুত হতে পারে। কিন্তু ২ < ২, এটা যেমন যৌক্তিকভাবে অসম্ভব (logical impossibility), অর্থাৎ কোন নির্ভুল যুক্তিতেই অমন একটি প্রতিপাদ্য সত্যি হতে পারে না, তেমন কিছু নয়।

কিন্তু আমাদের রোজকার অভিজ্ঞতার সাথে ওনাদের জ্যামিতির এরকম বহু উপপাদ্যই মিলছিল না। সে এক আশ্চর্য নতুন জগৎ! এতটাই আলাদা জ্যামিতি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা যে ঠিক কি ঘটেছে সেটা বুঝে উঠতে খানিক সময় লেগেছিল। ১৮৪৮ সাল থেকে গণিতজ্ঞরা এই নিয়ে ভীষণভাবে মাথা ঘামাতে শুরু করেন। এক সময় ফেলিক্স ক্লেইন প্রমাণ করলেন যে, এই জ্যামিতিগুলি যৌক্তিকভাবে স্ববিরোধমুক্ত যদি এবং কেবলমাত্র যদি ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যৌক্তিকভাবে স্ববিরোধমুক্ত হয়।

সমস্তটা বুঝে উঠতে ইতিহাসকে আরো অপেক্ষা করতে হয়েছিল, রীমানের প্রতিভার জন্য। ওনারা যে জ্যামিতিগুলো আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলোকে বলে অধিবৃত্তীয় জ্যামিতি (hyperbolic geometry)। পরে, ইউক্লিডীয় জ্যামিতির থেকে আলাদা কিন্তু এগুলোর থেকে অন্যরকম আরও জ্যামিতি আবিষ্কার হয়, সেগুলোকে বলা হয় উপবৃত্তীয় জ্যামিতি (elliptic geometry)। আর ইউক্লিডীয় জ্যামিতির থেকে আলাদা এই সমস্ত জ্যামিতিগুলোকে একসাথে বলা হয় অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি (non euclidean geometry)।

পরের অংশে আমরা দেখব এই জ্যামিতিগুলো কেন এমন অদ্ভুত আর এরা কিই বা বলছে।

[১] বোলেয়াই তাঁর আবিষ্কারের কথা যখন গাউস (Karl Frederick Gauss) কে জানান, ততদিনে গাউস নিজেও এই আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও এ নিয়ে তাঁর কোন কাজ কখনো প্রকাশিত হয়নি।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক স্বর্ণেন্দু শীল ইকোল পলিটেকনিক ফেডেরাল দে লসান-এ ডিফারেনশিয়াল ইক্যুয়েশন নিয়ে গবেষণা করেন। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জীনিয়ারিং এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (ব্যাঙ্গালোর) থেকে অঙ্ক নিয়ে পড়াশুনো করেছেন।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো

https://bigyan.org.in/2015/07/05/elements-of-geometry-part-3/

লেখাটি ‘বিজ্ঞান’ (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ০৫ জুলাই ২০১৫

প্রচ্ছদের ছবিটির উৎস: উইকিপিডিয়া

রামানুজনের ক্ষুরধার গণিতবুদ্ধি

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

কেমব্রিজ-এ থাকাকালীন রামানুজন-এর সাথে ভারতের আরেক উজ্জ্বল তারকা, প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ-এর পরিচয় হয়েছিল। এই সময়ের একটা মজার কাহিনী থেকে রামানুজন-এর গাণিতিক প্রতিভার এক ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। 'স্ট্র্যান্ড' ম্যাগাজিন-এ প্রকাশিত একটা ধাঁধা রামানুজন-এর সামনে পেশ করেছিলেন তার বন্ধু। ধাঁধাটা খানিকটা এইরকম: বেলজিয়াম-এর লুভাঁ শহরে একটা রাস্তা রয়েছে যাতে বাড়ির নম্বরগুলো ১,২,৩,... এইরকম ধারাবাহিকভাবে রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল, এমন একটা বাড়ি রয়েছে যার দুধারের বাড়ির নম্বরগুলোকে যোগ করলে একই সংখ্যা দাঁড়ায়। তাহলে মোট কটা বাড়ি রয়েছে ওই রাস্তার ওপর? এবং সেই বাড়ির নাম্বারটাই বা কত? বাড়ির সংখ্যাটা ৫০-এর বেশি কিন্তু ৫০০-র কম।

রামানুজন শুধু যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এর উত্তর দিলেন তাই নয়, ৫০-৫০০-র গণ্ডির বাইরে এই প্রশ্নটার যতগুলো উত্তর হয়, তার একটা ফর্মুলা বাতলে দিলেন। এর আড়ালে যে একটা অবিরত ভগ্নাংশ বা কন্টিনিউড ফ্র্যাকশন (continued fraction) রয়েছে, সেটা মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেললেন তিনি। অবিরত ভগ্নাংশ অর্থাৎ এমন একটা ভগ্নাংশ যার হর বা ডিনোমিনেটর (denominator)-এ আছে আরেকটা ভগ্নাংশ। যেমন এইটা:

$$1+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{2+\cdots}}}}}$$

ভগাংশটা অনন্তকাল ধরে না কষে কোথাও একটা আটকে দিলে তার লব আর হর (নিউমারেটর আর ডিনোমিনেটর) থেকে সমস্যাটার এক সেট সমাধান পাওয়া যায়। অন্য কোথাও আটকালে আরেক সেট সমাধান। এইভাবে ভগ্নাংশটাকে বিভিন্ন স্তরে আটকে সবকটা সমাধান বেরিয়ে আসে। কিভাবে সেটা দেখতে এই (https://www.math.auckland.ac.nz/~butcher/miniature/miniature2.pdf) লেখাটি পড়ো।

এই অঙ্কটা কষতে বসলে খানিক পরে এই ভগ্নাংশটা বেরিয়ে আসে ঠিকই, কিন্তু ধাঁধাটা শুনেই এর পেছনে যে একটা অবিরত ভগ্নাংশ রয়েছে, সেটা বলতে বোধহয় রামানুজন-ই পারতেন।

নিজেই চেষ্টা করে দেখো এটা। এই ধাঁধাঁটার একটা উত্তর হ'ল: সবসুদ্ধ বাড়ির সংখ্যা ৪৯। বলো তো, সেই বাড়ির নাম্বারটা কত যার দুদিকের সংখ্যা যোগ করলে একই যোগফল পাওয়া যাবে? (উত্তর শেষের পাতায়)

পায়রার বাক্সে স্থান-সঙ্কুলান সমস্যা

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়গুলির মধ্যে যেমন ছাত্র ছাত্রীদের কাছে সাধারণতঃ সবচেয়ে ভয়ের বিষয়, সবচেয়ে কঠিন বিষয় গণিত, তেমনই নিন্দুকদের পক্ষ থেকে গণিতের গবেষককে করে থাকা একটি তীর্যক প্রশ্ন হলো, "এই যে আপনার গবেষণা, এটা বাস্তব জীবনে কী উপকারটা করবে?" আজ গণিতেরই এমন এক 'ফলাফল' (result)-এর উল্লেখ করবো যা একদিকে অবশ্যই বাস্তব জীবনের কথা মাথায় রাখে, কিন্তু অন্য দিকে শুধু সারল্য ও সৌন্দর্যের জন্য যে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে পারে।

ফলাফল-টাতে যাওয়ার আগে একটা অতি পরিচিত দৃশ্যে চোখ বোলানো যাক। মধ্য কলিকাতা, অনেক সাবেকি বাড়ি এখনো টিকে আছে। বাড়িগুলোর ঘুলঘুলিতে পায়রার বাসা। ধরা যাক : কার্নিশের গা ঘেঁষে ৭ টা পায়রার খোপ রয়েছে। অথচ ওই খোপগুলোতে বসবাসকারী পায়রা পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮। তা হলে আধুনিক শহুরে নাগরিক জীবনের মতোই একটু স্থান-সঙ্কুলান সমস্যা দেখা দেবে না কী? হ্যাঁ, অবশ্যই দেবে। যদি না কোনো পায়রা গৃহত্যাগ করে। মোদ্দা কথা হলো: পরিস্থিতির চাপে অন্ততঃ এরকম একটা খোপ থাকবেই যেখানে কমপক্ষে দুটি পায়রা থাকবে। আর সহজ সরল এই পর্যবেক্ষণ থেকেই জন্ম নেয় 'পিজিয়ন-হোল প্রিন্সিপল' (Pigeonhole Principle)।

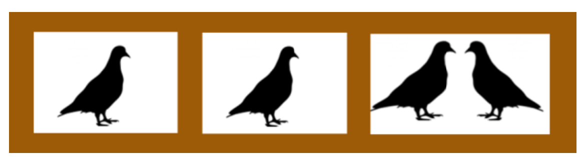

আরেকটা উদাহরণ নেওয়া যাক: একটি ঘরে জন্মদিনের নিমন্ত্রণবাড়ি উপলক্ষে 'n'-জন উপস্থিত (তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম 'n'-এর মান ২০১৬, অর্থাৎ নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ২০১৬ জন)। নিমন্ত্রিতের মধ্যে কেউ কেউ অপর কোনো নিমন্ত্রিতর পরিচিত। আবার কেউ কেউ কেবল বাড়ির কর্তারই (কর্ত্রী ও হতে পারে) পরিচিত। এবার গাণিতিক প্রশ্নটা হলো:

এই অভ্যাগতদের মধ্যে কমপক্ষে এমন দুই জন কী আছেন, যাঁদের পরিচিতিসংখ্যা সমান? 'সমান পরিচিতিসংখ্যা'-র একটা সহজ উদাহরণ হলো: 'ক' 'খ' কে চিনলে 'খ'-ও 'ক'-কে চিনবে , এবং আমরা বলবো 'ক' ও 'খ'-এর পরিচিতিসংখ্যা 'এক'।

প্রশ্নটা শুনে একটু দৈত্যাকার সমস্যা বলে মনে হলেও সমাধানের চেষ্টা করা যাক। পাঠকবন্ধুদের মাথা হয়তো ঘুরে যাচ্ছে '২০১৬' সংখ্যাটির জন্য (এখানে লক্ষণীয় ২০১৬-র পরিবর্তে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে আমরা ভাবা শুরু করতে পারি)। ধরা যাক নিমন্ত্রণ বাড়িতে ২ জন নিমন্ত্রিত। যদি কেউ কাউকে না চেনেন, তাহলে তাঁদের পরিচিতি সংখ্যা সমান এবং এই সংখ্যাটি হলো শূন্য। যদি একজন আরেকজনকে চেনেন তাহলেও তাঁদের পরিচিতি সংখ্যা সমান এবং এই সংখ্যাটি হলো এক। সুতরাং, ২ জন নিমন্ত্রিতের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হলো 'হ্যাঁ', ওই উপরীউক্ত শর্ত মেনে দুইজন অভ্যাগতকে আমরা অবশ্যই পাবো।

এবার পরিস্থিতিটাকে একটু জটিল করা যাক। ধরা যাক নিমন্ত্রিতের সংখ্যা তিন (সুবিধার্থে তাঁদের নামকরণও করলাম : A, B, ও C)। কি কি সম্ভাবনা হতে পারে ?

(১) প্রথম সম্ভাবনা : কেউই কাউকে চেনেন না। সুতরাং A, B, ও C সকলেরই পরিচিতির সংখ্যা সমান, তা হলো শূন্য।

প্রথম সম্ভাবনা : কেউই কাউকে চেনেন না।

(২) দ্বিতীয় সম্ভাবনা : যে কোনো একজন সকলকে চেনে। ধরে নিলাম সেই একজন হলো A, অর্থাৎ A-র পরিচিতির সংখ্যা দুই (B ও C) এবং এখনো পর্যন্ত B ও C -র পরিচিতিসংখ্যা সমান, তা হলো এক (যেহেতু দুজনেই A-কে চেনে এবং পরস্পরকে চেনে না)। একথা খুবই পরিষ্কার A-এর পরিবর্তে B বা C যদি অপর দুইজনকে চিনতো তাহলে একইভাবে সেই দুইজনের পরিচিতি সংখ্যা সমান হতো।

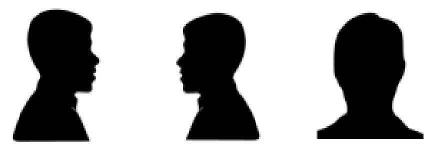

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : যে কোনো একজন সকলকে চেনে।

(৩) তৃতীয় সম্ভাবনা : সকলেই সকলকে চেনে। এক্ষেত্রে A, B, ও C সকলেরই পরিচিতি সংখ্যা সমান এবং তা হলো দুই।

তৃতীয় সম্ভাবনা : সকলেই সকলকে চেনে।

সুতরাং, ৩ জন নিমন্ত্রিতের ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হলো 'হ্যাঁ', ওই উপরীউক্ত শর্ত মেনে কমপক্ষে দুইজন অভ্যাগতকে আমরা অবশ্যই পাবো।

বোঝাই যাচ্ছে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২০১৬ অবধি গেলে এরকম একাধিক জটিল সম্ভাবনা আসবে। সমস্ত সম্ভাবনাগুলোর তালিকা না বানিয়েও এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া যায়। সেই সমাধানই আমাদের হাতে তুলে দেয় 'পিজিয়ন-হোল প্রিন্সিপল' (Pigeonhole Principle) বা 'বক্স

প্রিন্সিপল'(Box Principle)। এই ফলাফল অনুসারে আমরা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি: ২০১৬ কেন, যত সংখ্যক ('n'-জন) নিমন্ত্রিতই আসুন না কেন, তাঁদের মধ্যে কমপক্ষে দুই জন নিমন্ত্রিত সর্বদা থাকবেন যাঁদের পরিচিতি সংখ্যা সমান।

কিন্তু গণিতশাস্ত্রে প্রমাণহীন দাবী মূল্যহীন। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে: এই দাবীর যুক্তি বা প্রমাণ কোথায়?

যেহেতু নিমন্ত্রণবাড়িতে 'n'-জন নিমন্ত্রিত, সুতরাং কোনো একজন নিমন্ত্রিতের পরিচিতিসংখ্যা সর্বাধিক 'n – ১' হতে পারে (যেহেতু নিজেই নিজের সাথে পরিচিত, এই ধারণা বাস্তব জগতের মতো গণিতের জগতেও হাস্যকর)। আবার কোনো একজন নিমন্ত্রিতের সর্বনিম্ন পরিচিতিসংখ্যা শূন্য-ও হতে পারে (খুব অসামাজিক কোনো ব্যক্তি অপর কাউকে নাও চিনতে পারেন)। কল্পনা করা যাক, 'n'-সংখ্যক বড় বড় ঘর রাখা হলো। এক একটা ঘরকে ০ থেকে শুরু করে n – ১ অব্দি একটা করে নম্বর দেওয়া হলো। নিয়ম হলো, কোনো নিমন্ত্রিতের পরিচিতিসংখ্যা যদি 'i' হয়, তাঁকে 'i'-নম্বর ঘরে যেতে হবে। এই নিয়মটা মানতে গেলে দেখা যাবে যে একই সাথে ০ নম্বর ঘরে এবং n – ১ নম্বর ঘরে একজন নিমন্ত্রিত থাকবেন, এটা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যদি এমন কোনো নিমন্ত্রিত থাকেন যিনি অপর সকলকে চেনেন, তাহলে পরিচিতিসংখ্যা ০ এমন কেউ থাকতে পারেন না। সুতরাং n-জন নিমন্ত্রিত কে n – ১ টি ঘরে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ: কোনো একটি ঘরে কমপক্ষে দুইজন নিমন্ত্রিত থাকবেন-ই। সুতরাং নিমন্ত্রিতসংখ্যা যাই হোক, এমন দুইজন নিমন্ত্রিত অবশ্যই পাওয়া যাবে যাদের পরিচিতিসংখ্যা সর্বদা সমান।

আরও নিখুঁত করে বললে, আমরা 'জেনেরালাইজড পিজিয়ন-হোল প্রিন্সিপল' (Generalised Pigeonhole Principle) বক্তব্যটা এইভাবে রাখতে পারি : যদি 'n'-টি পায়রা 'k'-টি পায়রার খোপে বসতে যায় (যেখানে n > k), তাহলে কমপক্ষে একটি পায়রার খোপ পাওয়া যাবেই যাতে কমপক্ষে [n / k] ([n / k] := ফ্লোর (n / k))-টি পায়রা থাকবে। এমন কথার প্রমাণ তুলনামূলকভাবে কঠিন না। প্রমাণ করার জন্য আমরা method of contradiction* ব্যবহার করবো। ধরা যাক এরকম কোনো পায়রার খোপই পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সকল খোপেই (n / k)-র চেয়ে কম পায়রা আছে। সুতরাং:

মোট পায়রার সংখ্যা < (n / k) × (পায়রার বাক্সের সংখ্যা) = (n / k) × k = n

যা আমাদের সমস্যায় প্রদত্ত শর্তের সরাসরি বিরোধিতা করে (কারণ : পায়রার সংখ্যা = n, একথা প্রদত্ত)। সুতরাং আমরা যা কল্পনা করেছি, অর্থাৎ 'ধরা যাক এরকম কোনো পায়রার খোপই পাওয়া যাবে না', এই কথা সর্বৈব মিথ্যে। যা 'জেনেরালাইজড পিজিয়ন-হোল প্রিন্সিপল' (Generalised Pigeonhole Principle)-কেই সত্যি বলে প্রমাণিত করে।

'জেনেরালাইজড পিজিয়ন-হোল প্রিন্সিপল' গণিতের এক প্রধান শাখা 'Combinatorics' এর এক মূল ভিত্তিপ্রস্তর যার অগুন্তি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নাম্বার থিওরী, সম্ভাবনা-তত্ত্বের মতো গাণিতিক শাখাতে।

*method of contradiction: ধরা যাক একটি গাণিতিক বক্তব্য "A" আমাদের সত্যি হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। এই "method of contradiction" অনুসারে আমরা প্রথমে "কল্পনা" করবো যে "A" বক্তব্যটি মিথ্যা। যুক্তিশাস্ত্র (Logic)-এর নিয়মানুসারে "A বক্তব্যটি মিথ্যা => -A বক্তব্যটি সত্য।" এইবার আমরা "-A"-এর সত্যতাকে হাতিয়ার করে দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য "B" ও "-B" (নামকরণের সুবিধার্থে B নিলাম... তোমরা এই বক্তব্যকে যে কোনো বর্ণ দিয়েই চিহ্নিত করতে পারো)-এর সত্যতা প্রমাণ করবো; যা অবশ্যই অসম্ভব। সুতরাং আমাদের প্রকল্প (Hypothesis), অর্থাৎ "-A" -এর সত্যতা সঠিক নয়। সুতরাং "-A" মিথ্যা => A সত্য।

উৎসাহী পাঠকবন্ধুরা নিচের বইগুলিতে চোখ বোলাতে পারো :

(১) Mathematical Circles: (Russian Experience) by Dmitrii Vladimirovich Fomin and Sergei Aleksandrovich Genkin.

(২) Problem Solving Strategies by Arthur Engel

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

নীলাব্জ চ্যাটার্জী বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ অসলো-তে গণিত বিভাগে পি.এইচ.ডি ছাত্র এবং 'বিজ্ঞান'-এর স্বেচ্ছাসেবক।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো

https://bigyan.org.in/2017/02/13/pigeonhole/

লেখাটি 'বিজ্ঞান' (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৭

প্রচ্ছদের ছবিটির উৎস: উইকিপিডিয়া

অসীম শ্রেণীর সসীম যোগফল

স্বর্ণেন্দু শীল

নিচের সমীকরণটা লক্ষ করা যাক।

$$1+2+3+4+\ldots\ldots=-1/12.$$

এইটা সম্ভবত রামানুজনের সবচেয়ে বেশী প্রচারিত অদ্ভুত রেজাল্ট। বাঁদিকের অসীম শ্রেণির যোগফল অবশ্যই অসীম। ঋণাত্মক সংখ্যা হওয়ার তো প্রশ্নই নেই। তাহলে ওই 'সমান' '=' চিহ্নটার অর্থ কি?

অর্থটা আসলে খুব মজার। আর এইটাই রামানুজনের বহু কাজের সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে আমাদের সাহায্য করবে। তাঁর গণিতশাস্ত্রে দূরদর্শিতা ছিল সমসাময়িকদের থেকে অনেকটাই বেশি, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে গাণিতিক ভাষায় লেখার শিক্ষা তাঁর ছিল না, অথবা সেটাকে জরুরী মনে করেন নি।

ওই সমান চিহ্নটার অর্থ বুঝতে আমাদের অ্যানালিটিক নাম্বার থিওরির[১] এক অতি পরিচিত ফাংশনের কাছে যেতে হবে, যার নাম রীমানের জীটা ফাংশন (Riemann zeta function)। জীটা ফাংশন সংজ্ঞায়িত করা হয় এইভাবে -

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

যেখানে s একটা জটিল সংখ্যা (complex number) যার বাস্তব অংশ (real part) $Re(s)>1$ ($s=\sigma+it$ যেখানে $\sigma>1$).

এখন $Re(s)\leq 1$ হলে বাঁদিকের ঘাতশ্রেণি বা পাওয়ার সিরিজ রিপ্রেজেন্টেশনটা[২] আর সত্যি নয়, কিন্তু জীটা ফাংশন তখনো সংজ্ঞায়িত করা যায়, কমপ্লেক্স অ্যানালিসিসের (complex analysis) এর অ্যানালিটিক কন্টিনুয়েশন পদ্ধতি (analytic continuation technique) দিয়ে। সাদা বাংলায় অর্থ, এমন একটি অ্যানালিটিক ফাংশন আছে যা সমস্ত জটিল সংখ্যা s এর জন্যে সংজ্ঞায়িত এবং $Re(s)>1$ হলে তা রীমান জীটার ফাংশনের সঙ্গে মিলে যায়। কমপ্লেক্স অ্যানালিসিস বলছে এমন কোন ফাংশন আদৌ থাকলে তা একটামাত্র থাকবে, তাই আমরা নিশ্চিন্তে সেই ফাংশনটিকে রীমান জীটা ফাংশন-ই বলি, যে কোন s এর জন্য।

এইবারে আমরা রামানুজনের রেজাল্টের মানে বুঝতে পারব। আজকের অঙ্কের ভাষায় তার অর্থটার মধ্যে অদ্ভুত কিচ্ছু নেই। সেইটা হল:

$$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}.$$

তাই অঙ্ক ভুল নয়, মানে অসীম সংখ্যক ক্রমশ বড় হতে থাকা ধনাত্মক সংখ্যা যোগ করে ঋণাত্মক কিছু তো দুরের কথা, কোন সসীম সংখ্যা পাওয়ার মত পাগলামি সত্যিই নেই অঙ্কে। আবার রামানুজনও ভুল ছিলেন না। শুধু যা বলতে চেয়েছিলেন সেইটা আজকের অঙ্কের ভাষায় লেখেননি।

১. নাম্বার থিওরি বা সংখ্যাতত্ত্বকে খুব মোটাদাগের দুইভাগে ভাগ করা হয় সাধারণত। অ্যালজেব্রাইক ও অ্যানালিটিক (algebraic number theory ও analytic number theory)।

২. অর্থাৎ তখন ডানদিকের অসীম ঘাতশ্রেণিটার আর কোন সসীম যোগফল নেই, তাই সেই দিয়ে কোন ফাংশন সংজ্ঞায়িত করা আর সম্ভবপর নয়।

৩. অ্যানালিটিক ফাংশন (analytic function) এর একটা অর্থ জটিল সংখ্যার সেট থেকে জটিল সংখ্যার সেটে এমন একটি ফাংশন যা জটিল সংখ্যার অর্থে অবকলন সম্ভব (differentiable in the sense of complex functions)। কিন্তু এইটা একটা সংজ্ঞা হলেও একমাত্র সংজ্ঞা নয়।

প্রসঙ্গত পদার্থবিদ্যার নানা শাখায়, যেমন কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ও স্ট্রিং থিওরিতে এই 'যোগফল' প্রায়ই হাজির হয়। পদার্থবিদরা এটাকে 'যোগফল'-ই বলেন। তাঁদের এতে বিশেষ অসুবিধে হয়না, কারণ তাঁরা জানেন তাঁরা ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু এর ফলস্বরূপ নানান ওয়েবসাইটে ও একাধিক ইউটিউব ভিডিওতে কিছু মানুষের উৎসাহের আতিশয্যে এই সমীকরণটার নানারকম 'প্রমাণ' দেখতে পাওয়া যায়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল পরিমাণ বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া কাজের কাজ খুব কিছু হয় না সম্ভবত। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে জানাই, সে সমস্ত 'প্রমাণ' নিছক ভুল, কারণ এই তথ্যটাকে সত্যিই 'যোগফল' হিসেবে পড়লে তা আদৌ সত্যি নয়, তাই সেইটা প্রমাণ করাও সম্ভব নয়।

পাইলাম এক ধাঁধা

অমলেশ রায়

কোন এক রাজ্যের এক রাজা বলেছিল, "আমি চাই ধোঁয়া, ধূলো মুছে, নতুন গাছ, কয়েকটি উত্তম হাসপাতাল এবং অতি উত্তম পান্থশালা নির্মাণ করাই। যদি কোন ষাট বা তদোর্দ্ধ বছরের বৃদ্ধ আমায় সাহায্য চাই বলে তাহলে নিশ্চয় করা হবে। যে কোন স্থানে হাট বসবে না। সবাই সহযোগিতা করলে উত্তম ও সুউচ্চ দেশ অবশ্যই হবে এ রাষ্ট্র। যেটা খুব জরুরি তা হলো শিক্ষা ও পরিশ্রম। শুধু কথা বলে ফাঁকি দিয়ে নাম হবে না।"

সভা মধ্যে ঝম্ ঝম্ শব্দে হাততালি পড়ল। এখন কত বৃদ্ধ প্রজা রাজাকে মহানন্দে আশীষ জানাচ্ছে। তকাই এসে প্রণাম করতে গেলে প্রহরীরা প্রথমে বাধা দিলো। যদি রাজার সিংহাসনের কাছে ভুল ক্রমে কোন ভাবে এসে কিঞ্চিৎ অনিষ্ট ডেকে ফেলে। মাথায় তার বেশ বুদ্ধি ছিল। ভয় পেলে নিশ্চয় প্রহরীরা বেকায়দায় দুই দশ ঘা লাঠি কষাবে। নরম গরম কটি কথায় ধমকাবে। তাই ভালবেসে, কোমল মনে তাদের একটা পেন্নামই করলে। রাজা ভীষণ আনন্দের সঙ্গে তকাই কে ডেকে বললো, "তুমিতো বেশ বুদ্ধি দেখালে।" এ কথায় সমস্ত কোলাহল থেমে গেলো।

উপরের গল্পটি কেমন লাগল? না এটা কোনো সাধারণ গল্প নয়। এটার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা বিশেষ সংখ্যা যার ১০১ পর্যন্ত মান এখানে দেওয়া আছে। অর্থাৎ কেউ যদি গল্পটি হুবহু মনে রাখতে পারে (একটি শব্দও এদিক ওদিক না করে) তাহলে ওই ১০১ টি মান তাঁর নখদর্পণে থাকবে। এখন প্রশ্ন হ'ল আমি কোন সংখ্যার কথা বলছি? এবং সেই মান কি সূত্রে এখানে লুকিয়ে আছে? হ্যাঁ, এই সংখ্যাটার একটা নাম আছে আর আছে একটা চিহ্ন। এটার খোঁজ পাবে পিৎজা বা অলিম্পিক-এ। কি ধরতে পেরে গেছো? ঠিক আছে আরও একটু লাটাই ঘোরানো যাক। এই সংখ্যাটি একটি অনুপাত যার সম্পূর্ণ মান এখনো বের করা যায়নি এবং এটি পৌনঃপুনিক সংখ্যা (রেকারিং ডেসিমাল) নয়। আরও ভাল করে বলতে গেলে হলিউডে এই সংখ্যার "জীবন" নিয়ে একটা আস্ত সিনেমাও হয়ে গেছে। কি? পেরে গেছো ধরতে। তাহলে আর কি? খুঁজে বের করে ফেল কি ভাবে ওই সংখ্যাটা উপরের গল্পের মধ্যে লুকানো আছে। চাইলে উত্তরটা দেখ এই 'পত্রিকা'-র শেষের পাতায়।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

অমলেশ রায় বর্তমানে Sun Pharma, Ranbaxy Division-এ রিসার্চ ম্যানেজার। ম্যাক্স প্ল্যাংক ইনস্টিটিউট থেকে পোস্ট ডক এবং IACS কলকাতা থেকে পিএইচডি।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো :
https://bigyan.org.in/2017/12/25/numberriddle/

লেখাটি ‘বিজ্ঞান’ (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭

মূলদের ভিতর মূলদ, তার ভিতরে মূলদ

স্বর্নেন্দু শীল

"মূলদের ভিতর মূলদ, তার ভিতরে মূলদ" এই নিয়ে রামানুজনের বহু চমকপ্রদ ও মজার মজার ফর্মুলা আছে।

রামানুজনের একটি বিখ্যাত ফর্মুলা

$$2\sin\left(\frac{\pi}{18}\right) = \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2-\dots}}}}$$

চিহ্নগুলোর আবর্তন নিয়মটা হচ্ছে $-,+,+$.

রামানুজনের এই সংক্রান্ত আরও একটি অসাধারণ ফর্মুলা:

$$x+n+a = \sqrt{ax+(n+a)^2+x\sqrt{a(x+n)+(n+a)^2+(x+n)\sqrt{\dots}}}$$

যার $a=0, n=1, x=2$ র জন্যে আমরা পাই

$$3 = \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+\dots}}}$$

রামানুজনের এরকম ফর্মুলার সংখ্যা বিশাল। আর একটা মজার ফর্মুলা

$$\frac{2+\sqrt{5}+\sqrt{15-6\sqrt{5}}}{2} = \sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5-\sqrt{5+\dots}}}},$$

যেখানে চিহ্নগুলোর আবর্তনের নিয়ম $+,+,-,+$.

আজ এখানেই আমরা থামব। উপরের এই কয়েকটা মজার ফর্মুলায় গণিতে রামানুজনের অবদানের প্রতি সুবিচার তো দুরের কথা, তার সামান্য রূপরেখাটুকুও দেওয়া গেল না। তার একটা প্রধান কারণ ওনার অবদানের বেশিরভাগটাই সংখ্যাতত্ত্বে। সংখ্যা আমরা যতই সবাই ছোটবেলা থেকে চিনি না কেন, সংখ্যাতত্ত্ব অঙ্কের এক

জটিল ও দুরূহ বিভাগ। অঙ্কে যাদেরকে এলিপ্টিক ফাংশন বলে কিম্বা অ্যাসিমটোটিক এক্সপ্যানশন বলে, সেগুলো সম্পর্কে অন্তত সামান্য ধারণা ছাড়া সেই কাজগুলোর আগা-মুড়ো কিছুই বোঝা ও বোঝানো বস্তুত অসম্ভব। অথচ এলিপ্টিক ফাংশন কি ও সংখ্যাতত্ত্বে তার ব্যবহার এইটা নিজেই একাধিক পূর্ণদৈর্ঘ্যের লেখা দাবী করবে। এই লেখাটি নিছকই রামানুজনের মৃত্যুদিনে এই বিরল প্রতিভার সম্মানার্থে তাঁর কাজের সহজবোধ্য কিছু টুকরো অংশ বাকিদের সাথে ভাগ করে নেওয়া মাত্র।

নুড়ি সরানোর খেলা ও গোল্ডেন রেসিও

নীলাব্জ চ্যাটার্জী

সংখ্যার রাজত্বে রহস্যের হাতছানি চিরন্তন। ছোটবেলায় 0, 1, 2, 3, ... ,9 শেখার পরপরই আমরা শিখি এই দশটি সংখ্যা (digit)-কে ব্যবহার করে পূর্ণ সংখ্যার (natural numbers) অসীম দিগন্তে বিচরণ করতে। ব্যাপারটা খুব সহজ। "0" এর সাথে "1" যোগ করে "1", "1" এর সাথে "1" যোগ করে "2", ... ; এইভাবেই এক পা এক পা করে সমস্ত পূর্ণ সংখ্যা শেখা। এর ঠিক পরে পরেই জানা যায় এই পূর্ণ সংখ্যাগুলি দু'ধরণের: জোড় (even) এবং বিজোড় (odd)। এই অবধি শেখার পরই যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "আচ্ছা!! 2, 4, 6, 8, 10, ... এই শ্রেণীতে 10 এর ঠিক পরের সংখ্যাটা কী ?" বা "বলো দেখি 1, 3, 5, 7, 9, ... এই শ্রেণীতে 9 এর ঠিক পরের সংখ্যাটা কী ?", তাহলে চোখের নিমেষে উত্তর চলে আসবে 12 (প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে) বা 11 (দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে), কারণ প্রথমটি জোড় ও দ্বিতীয়টি বিজোড়ের শ্রেণী।

শুরুতেই বলেছিলাম রহস্যময় সংখ্যাজগতের কথা। এইরকমই এক রহস্যের বিষয় হলো একটি বিশেষ ধরণের সংখ্যার শ্রেণী : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... । তোমরাই একটু ভেবে বলো তো এই শ্রেণীটার বিশেষত্ব কী? তোমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই শ্রেণীতে 21 এর পরের সংখ্যাটা কী হবে? তাহলে তোমাদের উত্তর কী হবে? এই অবাক করা শ্রেণীটি ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় গণিতচর্চার ফসল হলেও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের জগতে (পরবর্তীকালে বিশ্ব গণিতের প্রাঙ্গনেও) এটি চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে "ফিবোনাচ্চি শ্রেণী" (Fibonacci Sequence) হিসেবে[১]। এ'কথা প্রমাণ করা যায় যে ফিবোনাচ্চি শ্রেণীর n-তম ("n" একটি পূর্ণ সংখ্যা) সংখ্যাটি যদি "fn" হয়, তা'হলে তা'র সাংখ্যমান হলো:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

চটপট "n" এর জায়গায় 1, 2, 3, 4, 5, ... বসিয়ে একবার দেখে নাও তো পরপর 1, 1, 2, 3, 5, ... সংখ্যাগুলো পাচ্ছো কিনা!!

যাকগে, "ফিবোনাচ্চি শ্রেণী" নিয়ে গল্প না হয় অন্য কোনদিন করা যাবে। আজকের গল্পের নায়ক হলো ওপরের ওই আজব ফর্মুলার প্রথম ভগ্নাংশটা, অর্থাৎ:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

যা গণিতের জগতে "সোনালী অনুপাত" বা "গোল্ডেন রেসিও" (Golden Ratio) নামেই পরিচিত। এতো গেলো নায়কের কথা। কিন্তু এই গল্পের চিত্রনাট্যের বিষয়বস্তুটা তাহলে ঠিক কী ??

চিত্রনাট্যটি আমাদের স্কুলজীবনের ক্লাসঘরের একটি খেলা নিয়ে, যা নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে তোমরা অনেকেই হয়তো ধাঁধার মতো করে খেলে বাহবা কুড়িয়েছো। খেলাটি এইরকম:

"দুই বন্ধুর সামনে দুটি নুড়ির সংগ্রহ রাখা আছে। একটিতে "a" এবং আরেকটিতে "b" সংখ্যক নুড়ি আছে (যেখানে a, b দু'টিই পূর্ণ সংখ্যা এবং a, b-এর চেয়ে বড়)। খেলার নিয়মটি হলো: দুই বন্ধু একবার একবার করে (alternately) যে কোনো একটি নুড়ির সংগ্রহ থেকে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার নুড়ি তুলে নিতে পারবে। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মজাটা হলো, যে কোনো সংখ্যক নুড়ি তোলা যাবে না। কোনো সংগ্রহ থেকে কেবলমাত্র অপর সংগ্রহে অবশিষ্ট নুড়ির গুণিতক সংখ্যক (একগুণ, দ্বিগুণ, ...) নুড়িই তোলা যাবে (অর্থাৎ একটি সংগ্রহে তিনটি আর অপর সংগ্রহে দশটি নুড়ি থাকলে কোনো এক বন্ধু ওই দশটি নুড়ি থেকে তিন / ছয় / নয় যে কোনো সংখ্যক নুড়ি তুলতে পারে)। তাদের মধ্যে যে, কোনও একটি সংগ্রহের শেষ নুড়িটি তুলে নেবে, সেই-ই বিজয়ী হবে।"

এই খেলার প্রেক্ষাপটে গাণিতিক প্রশ্নটি হলো এরকম : (a , b) এই জোড়াটির ওপর কি শর্ত চাপালে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রথম যে নুড়ি তুলবে, সেই-ই জিতবে?? আরো সহজ করে বলতে গেলে "a" ও "b" এর মধ্যে কি এমন গাণিতিক সম্বন্ধ থাকতে পারে যাতে যে-ই প্রথম নুড়ি তুলুক সে-ই জিতবে ?? একটু ভেবে দেখো তো। কিছু শর্ত বের করতে পারো কিনা!!

যারা অনেক ভাবার পরেও পথ খুঁজে পাচ্ছো না তাদের বাঁচাতেই রঙ্গমঞ্চে ওই "গোল্ডেন রেসিও"র আবির্ভাব। সমস্যাটির সমাধানের পথে হাঁটার আগে কিছু ভাষার গোলযোগ পরিষ্কার করে নিই পাঠকবন্ধুদের সাথে :

- দুটি সংগ্রহে যদি "i" ও "j" সংখ্যক নুড়ি থাকে কোনো একটি মুহূর্তে তাহলে সেই সময়ের খেলাটির অবস্থার পরিচায়ক হলো (i, j)-এই জোড়াটি, অর্থাৎ খেলার অবস্থা (i, j) বললে বুঝবো একটি সংগ্রহে "i" টি, অপর সংগ্রহে "j" টি নুড়ি আছে। বলা বাহুল্য (i, j) এবং (j, i) একই অবস্থার পরিচায়ক।

- খেলার অবস্থা (i, j)-তে এসে যদি দেখা যায় কাঙ্খিত "শর্ত" মানা হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এইবার যে নুড়ি সরাবে সে জিততে চলেছে, তাহলে সেই অবস্থাকে বলবো "বিজয়ী অবস্থা"।

কাগজ-কলমে হিসেব শুরু করার আগে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া যাক:

- (i, j) বা) j, i) এই অবস্থাদুটি হয় দু'টিই "বিজয়ী" অথবা দু'টিই "পরাজয়ী" (অর্থাৎ বিজয়ী নয়(।
- একটি অবস্থা) i, j) বিজয়ী হবে কিনা, তা নির্ভর করছে তাদের অনুপাত) i/j)-এর উপরে।
- সুতরাং, যদি আমরা বিজয়ী অবস্থাগুলোর জন্য দায়ী ধনাত্মক মূলদ সংখ্যা) i/j)-দের খুঁজে বার করতে পারি তাহলেই আমরা সমাধান পাবো।

- যে খেলার বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে, তা'তে যদি a/b কখনো পূর্ণ সংখ্যা হয় , তাহলে সেটি একটি বিজয়ী অবস্থা।

এবার তোমাদের কাছে এই জেতার রহস্যটা ফাঁস করার সময় হয়েছে। ফলাফলটি কিছুটা এরকম:

একটি অবস্থা) a , b) বিজয়ী অবস্থা হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি) iff / if & only if)[২]

$$\frac{a}{b} > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

অর্থাৎ, দুটি সংগ্রহে নুড়ি সংখ্যা: "a" এবং "b"-এর অনুপাত) যেখানে a, b-এর চেয়ে বড় (যদি "গোল্ডেন রেসিও"-এর চেয়ে বড় হয় তাহলে সেই অবস্থা) a , b)-টি একটি বিজয়ী অবস্থা হবে। আবার কোন একটি অবস্থা) a , b) যদি বিজয়ী অবস্থা হয় তা'হলে দু'টি সংগ্রহের অনুপাত "গোল্ডেন রেসিও"-এর চেয়ে বড় হবে।

এই বক্তব্যের প্রমাণটা তেমন বড় বা কঠিন না। ঠান্ডা মাথায় চেষ্টা করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই পারবে। চিন্তা-ভাবনা শুরু করার জন্য কেবল মাথায় রাখো কোনো একটা অবস্থা) i , j) থেকে খেলা শুরু হওয়ার অর্থ হলো : i/j বা j/i এর মধ্যে যে ভগ্নাংশটি বড় তা'র থেকে একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এমনভাবে বাদ দিতে হবে, যাতে বিয়োগফলটা শূন্য বা তা'র চেয়ে বড় হয়। আর খেলা শেষ হওয়ার অর্থ হলো : খেলায় অংশগ্রহণকারী দুই বন্ধুর কেউ একজনের ক্ষেত্রে এই বিয়োগফলটা শূন্য। এখন তোমাদের মগজাস্ত্রে শাণ দেবার পালা। পুরো প্রমাণটা করতে পারলে আমাদের জানিও এই ঠিকানায়: bigyan.org.in@gmail.com।

এবার বোঝা গেলো? কেন আমি "গোল্ডেন রেসিও"-কে এই খেলার নায়ক বলছিলাম বারবার!!

উৎসাহী পাঠকবন্ধুরা এই "ফিবোনাচ্চি শ্রেণী" এবং "গোল্ডেন রেসিও" সম্বন্ধে আরও জানতে নিচের বইগুলো অবশ্যই পড়তে পারো :

- The Colossal Book of Mathematics: Classic Puzzles, Paradoxes, and Problems : Number Theory, Algebra, Geometry, Probability, Topology, Game Theory, Infinity, and Other Topics of Recreational Mathematics by Martin Gardner .
- Mathematical Morsels by Ross Honsberger, Mathematical Association of America Publishers.
- Mathematical Miniatures by Svetoslav Savchev & Titu Andreescu, Mathematical Association of America Publishers.

টীকা:

[১] ফিবোনাচ্চি শ্রেণী := 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... এই শ্রেণীটিকে গণিতশাস্ত্রে "ফিবোনাচ্চি শ্রেণী" বলা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর n-তম (এখানে) সংখ্যাটিকে fn দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তা'হলে fn= $f_{n-1}+f_{n-2}$ এবং $f_1=1$, $f_2=1$। অর্থাৎ, এই শ্রেণীর পরপর দু'টি সংখ্যাকে যোগ করলে আমরা তৃতীয় সংখ্যাটি পাবো।

[২] iff / if & only if := এটা গণিতশাস্ত্রের এক বহুল প্রচলিত পরিভাষা। বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় যদি এবং কেবলমাত্র যদি। অর্থাৎ, যদি দুটি বক্তব্য (Statement) আগে থেকে প্রদত্ত থাকে এবং বোঝানোর সুবিধার্থে যদি ধরে নি যে বক্তব্য দু'টি হলো "A" এবং "B" , তাহলে আমরা গণিতের ভাষায় "A if & only if B" তখনই বলবো যদি "A" কে সত্য বলে ধরে নিলে "B"-এর সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং উল্টো দিক থেকে "B" এর সত্যতা কল্পনা করলে "A"-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই ঘটনাটিকে "A if & only if B" বা "A iff B" বা "A $\Leftrightarrow$ B" দ্বারা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

নীলাব্জ চ্যাটার্জী বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ অসলো-তে গণিত বিভাগে পি.এইচ.ডি ছাত্র এবং 'বিজ্ঞান'-এর স্বেচ্ছাসেবক।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখো: https://bigyan.org.in/2017/05/08/golden-ratio/

লেখাটি 'বিজ্ঞান' (bigyan.org.in)-এ প্রকাশিত হয়েছিল ০৮ মে ২০১৭

Π-লাম এক ধাঁধা (উত্তর)

পিৎজা বা অলম্পিক–এর মধ্যে মিল হ'ল বৃত্ত, প্রথমটার আকৃতি আর দ্বিতীয়টির পতাকায় পাঁচটা রিং বা বৃত্ত। আর বৃত্তাকার যে কোন কিছু দেখলে প্রথম যা মাথায় আসে তা হ'ল পাই (π)। পাই হ'ল বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসে অনুপাত তা সে বৃত্ত যত ছোট বা বড়ই হোক না কেন। 'লাইফ অফ পাই' সিনেমাটি যারা দেখেছ তাদের হয়ত মনে থাকবে ব্ল্যাক বোর্ড জুড়ে পাই এর বিশাল সংখ্যা মান এর কথা। এখন পর্যন্ত দশমিকের পরে এক লক্ষ কোটি সংখ্যার আবিষ্কার হয়েছে (এক ট্রিলিয়ন–এর কিছু বেশী)। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসে অনুপাতের মান গণিতজ্ঞরা এখনও শেষ করে উঠতে পারেননি। এ গণনা শুরু হয়েছে তা প্রায় তিন–চার হাজার বছর আগে। পৃথিবীর অসংখ্য গণিতজ্ঞের সঙ্গে ভারতের আর্যভট্ট, নিলাকান্ত সোমায়াজি এবং রামানুজন–এর অবদান গণিত ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। ২০১৫ সালে ভারতের রাজভীর মীনা পাই (π) এর ৭০,০০০ মান স্মরণে রাখার গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

তাহলে বোঝা গেল পাই এর ১০১ মান এই গল্পে লুকিয়ে রাখা আছে। কিন্তু কি ভাবে? নীচে সমাধান দেওয়া হ'ল।

সংখ্যা	*শব্দের শেষ বর্ণ সঙ্কেত*	*উদাহরণ*
১ - এক	ক, খ, ক্ষ	কেক, তাক, দেখা, নাক, ফাঁকি, শিক্ষা
২ - দুই	ই	কই, খাই, যাই, নাই
৩ - তিন	ন, ণ	নয়ন, বায়না, লাবণ্য
৪ - চার	র, ড়	ঘড়ি, হাতুড়ি, চুরি
৫ - পাঁচ	চ, ছ, জ	রাজা, লুচি, কাছা
৬ - ছয়	য়	ভয়, জয়, তনয়
৭ - সাত	ত, ৎ, থ	কলিকাতা, বিশ্বস্ত, কথা
৮ - আট	ট, ঠ	মাঠ, কপাট, বিস্কুট
৯ - নয়/নবম	ম	গরম, হজম, পদ্মা
০ - শূন্য	স, শ, ষ	হাসি, খুশী, মহিষ

এখন যদি আমরা গল্পের প্রথম বাক্যটি দেখি তাহলে দেখব সেখানে ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২ মান লুকিয়ে আছে। কি ভাবে তা দেখানো হ'ল –

"কোন এক রাজ্যের এক রাজা বলেছিল, "আমি চাই ধোঁয়া, ধূল মুছে, নতুন গাছ, কয়েকটি উত্তম হাসপাতাল এবং অতি উত্তম পান্থশালা নির্মান করাই।"

কোন = ৩, এক = ১ রাজ্যের = ৪, এক = ১, রাজা = ৫, আমি = ৯, চাই = ২, ধোঁয়া = ৬, মুছে = ৫, নতুন = ৩, গাছ = ৫, কয়েকটি = ৮, উত্তম = ৯, অতি = ৭, উত্তম = ৯, নির্মান = ৩, করাই = ২।

অর্থাৎ এই লাইনটা মনে রাখলে আমরা অনায়াসে দশমিকের পরে ১৬ টি সংখ্যা মনে রাখতে পারব। এখন তোমরা চাইলেই এই গল্পটি থেকে পাই এর ১০১ টি মান পেয়ে যাবে। দেখতো সেটা নীচের সংখ্যার সাথে মিলছে কিনা।

π = ৩.১৪১৫৯ ২৬৫৩৫ ৮৯৭৯৩ ২৩৮৪৬ ২৬৪৩৩ ৮৩২৭৯ ৫০২৮৮ ৪১৯৭১ ৬৯৩৯৯ ৩৭৫১০ ৫৮২০৯ ৭৪৯৪৪ ৫৯২৩০ ৭৮১৬৪ ০৬২৮৬ ২০৮৯৯ ৮৬২৮০ ৩৪৮২৫ ৩৪২১১ ৭০৬৭৯

এই মান মনে রাখার জন্য পাই–এম (পাই পোয়েম) নামে এক ধরণের কবিতা বা ছড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে। যদিও যারা রেকর্ড গড়েন তাঁরা অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন (Piphilology)। বাংলা ভাষায় এমন পাই ছড়া আমার চোখে পড়েনি তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এখানে দশমিকের পরে একশত মানকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

‘পাই’ ছড়া

তিন এক চার এক

পাঁচ নয় দুই

পই পই করে বলি

শুনিস না তুই

এর পর ছয় পাঁচ

তিন পাঁচ আট

অঙ্কের কথা শুনে

ফাঁকা হয় মাঠ

নয় সাত নয় তিন

দুই তিন আট

বিষম লাগলো বুঝি

ষাট ষাট ষাট

চার ছয় দুই ছয়

চার তিন তিন

অভ্যাস কর যদি

রোজ রাত দিন

আট তিন দুই পাঁচ

নয় পাঁচ ‘খালি’

‘খালি’ মানে শূন্য

দাও হাত তালি

হাত তালি দিতে লাগে

জেনো দুটো হাত

দুই আট আট চার

এক নয় সাত

আর এক ছয় নয়

তিন নয় নয়

পাই–এর মান কে যেন

পেয়ো নাকো ভয়

তিন পাঁচ সাত এক

তার পর ‘জিরো’

পঞ্চাশ পের হ’ল

আজ তুমি হিরো

পাঁচ আট দুই শেষে

শূন্য ও নয়

সাত চার নয় চার

কেটে গেছে ভয়

চার পাঁচ নয় দুই

তিন জিরো সাত

খিদে পেলে খেয়ে নিই
পেট ভরে ভাত
আট এক ছয় চার
শূন্য ও ছয়
অনুমতি পেলে করি
এভারেস্ট জয়
দুই আট ছয় দুই
জিরো আর আট
ভুলে যাব এ ছড়া কি
সে বালাইষাট
নয় নয় আট ছয়
দুই আট জিরো
মনবল আজ আমার
মজবুত দৃঢ়
তিন চার আট দুই
পাঁচ তিন চার
শ্রীনিবাস রামানুজন
অঙ্কের স্যার
দুই এক এক সাত
জিরো ছয় একি
একশত হতে আর
দুটো ধাপ বাকী
সাত নয় শেষ হ'ল
আমার এই ছড়া

ট্রিলিয়ন আছে আরও

সংখ্যাতে ভরা

ব্যাস আর পরিধির

এ আজব খেল

অঙ্কেতে কেন তবু

দেয় না নোবেল?

রামানুজনের ক্ষুরধার গণিতবুদ্ধি (উত্তর)

এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল ৩৫ নম্বর বাড়ি।

তোমাদের সুবিধার জন্য একটা সমীকরণ দেওয়া হ'ল-
১+২+৩+...+n = n(n+১)/২

এই সমীকরণটা ব্যবহার করে পাবে:

১+২+৩+...+৩৪=৫৯৫

৩৬+৩৭+৩৮+...+৪৯ = (১ + ২ + ... + ৪৯) - (১ + ২ +... ৩৫) = ৫৯৫

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে।
  ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।